ভেতরে
মোদীর বাণী ... কর্পোরেট মদতপুষ্ট ফ্যাসিবাদের ২
এক বেয়াদপ সরকার ও নিধিরাম কমিশন ... ৩
মিড-ডে মিল ট্র্যাজেডি ৪
রাস্তার গণতন্ত্রের অধিকার ৫
... ইতিহাস বিরুদ্ধ পরমাণু নীতি ৬
... এ রক্তস্নান বন্ধ কর ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২০ সংখ্যা ২৬ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৫ জুলাই ২০১৩

তৃণমলের সন্ত্রাসই শেষ কথা নয়

তৃণমূল কংগ্রেসের ২ বছরের শাসনে, বিশেষ করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়কালে তার শাসনের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পেয়ে গেছে। এর এক একটা নমুনা হল—এক, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করে যে তার জেলায় বিরোধী কোন রাজনৈতিক পার্টিকে ভোট করতে দেওয়া হবে না, ভোট করবে তারা নিজেরাই। দুই, বীরভূমে নমিনেশন পর্ব শুরুর আগেই জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বিরোধী পার্টির নমিনেশন আটকে দেওয়ার জন্য কর্মী বাহিনীর কাছে আহ্বান জানায়, পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষের বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বলে। তিন, বাইক বাহিনী সম্পর্কে আদালতের রায় প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী তাচ্ছিল্যভরে জানায়—কোর্টের রায়ও থাকবে, বাইক বাহিনীও চলবে। চার, অনুব্রত মণ্ডল সম্পর্কে মন্ত্রী মদন মিত্র বলে যে, অনুব্রত ঠিক ঠিক ভাবেই জনগণের কথাগুলো সি পি এমের কানে ঢোকাতে পেরেছে। মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী ও মদন মিত্র মজার ছলে বললেও তার অন্তর্নিহিত হিংস্রতা চাপা থাকে না। এরপরে লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বিরোধী নেতার মুণ্ডু কাটার কথা ঘোষণা করে। ... ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক নমুনাই চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এগুলো আদপেই এক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এ সমস্ত এক সামগ্রিকতা নিয়েই হাজির হয়েছে। এ সবের কেন্দ্রে রয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। সবই তাঁর নজরের মধ্যেই ঘটছে এবং এক সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনেই ঘটছে। তিনি নিজেই সমস্ত বিরোধী দল ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। আর যখন এটা যুদ্ধ, তখন ন্যায়, নীতিই বা থাকবে কেন? আইনের শাসন ও গণতন্ত্রই বা থাকবে কেন? এখন মমতা শাসনে সবকিছুই পদদলিত।

অথচ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটা বলা যেতেই পারে যে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী পক্ষ সি পি এম তথা বামফ্রন্ট শাসক তৃণমূলকে সরিয়ে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার অবস্থায় নেই। এখনও তারা জনগণের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। অন্যান্য বাম ও বিপ্লবী শক্তি সম্ভাবনাময় হলেও এখনও বড় শক্তি হয়ে ওঠেনি। সুতরাং বলা যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে অন্তত তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকতো। তবে মমতা ব্যানার্জী জয়ের জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠছেন কেন? কারণ এটা বাস্তব যে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে জনসমর্থন পেয়েছিল তাতে ক্ষয় ধরতে শুরু করেছে। বিগত হাওড়া লোকসভা উপনির্বাচনে এটা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। বিজেপি যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে তাদের প্রার্থী না তুলতো তা হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ফলাফল কি দাঁড়াতো সে প্রশ্ন থেকেই যাবে!

ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪ দফা শেষ হয়েছে। রক্ত ঝরেছে অনেক, এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২৫। পঞ্চম দফার শেষে কতজন মানুষের জীবন যাবে তা জানা নেই। আর এই ধরনের নির্বাচনের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে সন্ত্রাস, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট তো আছেই। শাসক দলের পক্ষ থেকে এতো সন্ত্রাস নিছকই নির্বাচনে সাধারণ মাপের জয়-পরাজয়ের জন্য নয়। মমতা ব্যানার্জীর প্রয়োজন নিরঙ্কুশ জয়, নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সামগ্রিকভাবে তৃণমূল নেত্রী পরিস্থিতির ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। তিনি নিজেও বুঝছেন যে তাঁর সমর্থন ভিত্তিতে ক্ষয় ধরেছে। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা মমতা ব্যানার্জীর ওপর আস্থা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন, মমতা ব্যানার্জীর পাশ থেকে সরে যাচ্ছেন। আর তৃণমূল শাসনের যে শ্রেণী চরিত্র তাতে তাদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে কোন জনমুখী উন্নয়ন কর্মসূচী হাজির করা সম্ভব নয়। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ আধিপত্য পেতে ও রাজ্যে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে তার কাছে একমাত্র বিকল্প হল পেশীতন্ত্রের প্রয়োগ—হুমকী, জোরজুলুম, সন্ত্রাস, গুণ্ডামী ইত্যাদি—রাজনীতির অপরাধীকরণ ঘটানো। আর এগুলো আগামীতে বেড়েই চলবে। মমতা ব্যানার্জীর শাসনের পক্ষে মজুত বাহিনী হল সমাজের লুম্পেন, গুণ্ডা, অপরাধীরা। এদের মধ্যে অনেকেই আগে সি পি এমের ছত্রছায়ায় ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনায়, সমাজবিরোধী, পশুশক্তির দাপাদাপির ঘটনায় মমতা ব্যানার্জীর উদাসীনতার অন্যতম কারণ রয়েছে এখানেই। এতে সমাজবিরোধী, পশুশক্তি উৎসাহিতই হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতিতেও যখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানারে সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের প্রবেশ ঘটছে তখন মমতা ব্যানার্জী

আটের পাতায় দেখুন

কামদুনির বিচার পিছচ্ছে কেন? বারাসত আদালতে গণক্ষোভ

কামদুনির নারকীয় গণধর্ষণকারী ও খুনীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে কামদুনি থেকে কলকাতা উত্তাল হলেও কামদুনির বিচার বিলম্বিতই হচ্ছে। ফাস্ট ট্রাক কোর্টে বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এই প্রত্যাশা থাকলেও ১২ তারিখে কোর্টের কাজ বন্ধ থাকার পর ২২ জুলাই কোর্টের দিন ধার্য হয়। কিন্তু ২২ তারিখও বিচারের কাজ শুরু না হয়ে কোর্টের দিন একমাস পিছিয়ে ফেলা হয়েছে ২৩ আগস্ট। মূল অপরাধীদের একজনকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ এবং সি আই ডি-র চার্জশীটে এখনও সমস্ত অপরাধীদের নাম যুক্ত না করতে পারার কারণে এদিনও সেই বিচার ব্যবস্থার গয়ংগচ্ছ ভাবই পরিলক্ষিত হয়। এভাবে দিন ক্রমাগত পিছিয়ে কামদুনি কেসের গুরুত্বকে লঘু করার প্রয়াস চলছে বলে কেউ কেউ কোর্ট চত্বরে বলেন।

সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বারাসাত কোর্ট চত্বরে কামদুনির দ্রুত বিচারের দাবিতে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। আওয়াজ ওঠে—'অপরাধীদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের আঁতাত ধ্বংস হোক', 'দুষ্কৃতিদের মদতদাতা পুলিশ, প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতাদের শাস্তি চাই'। বিক্ষোভে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদিকা অর্চনা ঘটক। কোর্ট চত্বরে মহিলা সমিতির বিক্ষোভ ও মিছিল কোর্টের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কমরেড চারু মজুমদারের
৪১ তম শহীদ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়ার তাৎপর্য কি?

শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারাটাই কমিউনিস্ট হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি নয়। কে প্রকৃত কমিউনিস্ট? যিনি জনগণের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারেন। এবং এই আত্মত্যাগ কোন বিনিময়ের প্রত্যাশা করে নয়। দুটো পথ—হয় আত্মত্যাগ, নয় আত্মস্বার্থ। মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই। .....মাও-এর "জনগণের সেবা কর"—শ্লোগানের তাৎপর্য এখানেই। জনগণকে সেবা করা ছাড়া জনগণকে ভালবাসা যায় না। জনগণকে সেবা করা যায় একমাত্র আত্মত্যাগ করেই। প্রকৃত কমিউনিস্ট হতে গেলে এই আত্মত্যাগ আয়ত্ব করতে হবে। জনগণের সেবা করার মানে হচ্ছে জনগণের স্বার্থে বিপ্লবের স্বার্থে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ দেওয়া। এই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ দেওয়ার মধ্য দিয়েই জনগণের সাথে মিশে যাওয়া ঘটবে। কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জনগণকে ভালবাসা যায়, জনগণের সেবা করা যায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিপ্লবীর রূপান্তর সাধিত হয়। তাই বিপ্লব মানে শুধু বৈষয়িক লাভ নয়। বিপ্লব মানে এই রূপান্তর—উপলব্ধির, আদর্শের, চিন্তাধারার রূপান্তর। তাই বৈষয়িক লাভ হিসাব করে বিপ্লবের লাভ বিচার করাটা সঠিক নয়। বিপ্লব মানে চেতনার আমূল রূপান্তর। কি সেই চেতনা? জনগণকে সেবা করার চেতনা, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেতনা, জনগণকে ভালবাসার চেতনা। বিপ্লব মানেই এই রূপান্তর— কি সমাজের, কি ব্যক্তির।...."

- চারু মজুমদার

সম্পাদকীয়

রক্ষকরাই যেখানে যৌনশোষক

না, কোনই পরিবর্তনের লক্ষণ নেই। বরং পরিবর্দ্ধনের প্রবণতাই দিনদিন আরও বেপরোয়া হচ্ছে, এটা চলতে পারার আরও একটা ভয়ঙ্কর কারণ হল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার—বিশেষত রাজত্বের সৃষ্ট পরিমণ্ডল, যার দৌলতে অবাধ সুযোগ ও মদত পাচ্ছে যৌন অপরাধীরা। তাই কোনও পরিবর্তন নেই এই বঙ্গরাজ্যে নারী ধর্ষণের, নারীর ওপর সংঘটিত যাবতীয় নারকীয় যৌন উৎপীড়নের। দহন চলছে প্রতিদিন প্রতিরাতে। ঘরে-বাইরে কোথাও নিশ্চিত নিরাপত্তা নেই। কোনও বয়সীর কোথাও নিঃসংশয় থাকার উপায় নেই। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় 'পরিবর্তন' হয়েছে। কতই না 'মা-মাটি-মানুষের' স্বার্থ দেখবে বলে! শুধু কি তাই! সরকারের মুখ্যপদে একদা 'নেতা'-র জায়গায় জাঁকিয়ে এখন 'নেত্রী'। কিন্তু ধর্ষণ, খুন, সমস্ত ধররের নারী নির্যাতন, যৌন নিগ্রহের পরিঘটনার কোনও পরিবর্তন নেই। শাসকদল-থানা-পুলিশ-আইন-আদালত সব মিলিয়ে চরম অরাজকতার আঁতাতের ধৃতরাষ্ট্র-ব্যবস্থাই তো পরিবর্তিত রাজত্বে পাওয়া পরমপ্রাপ্তি! প্রায় প্রতিদিন সংবাদজগতে প্রকাশ হয়ে চলেছে নারীর ওপর অত্যাচারের এক ডজন তথ্যচিত্র। একেকদিন বড় খবর হয় কোন ঘটনা। পার্ক স্ট্রীট থেকে কাটোয়া, জগাছা থেকে বারাসত, কামদুনি থেকে এখন সংবাদজগতে চলছে রাজারহাট কাণ্ড নিয়ে তোলপাড়। যৌন আক্রমণ থেকে বাঁচতে চলন্ত এক্সপ্রেস থেকে ঝাঁপ দেওয়া, দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত মহল্লায় ভর সন্ধ্যায় বিদেশিনীর দৌড় ও কোনক্রমে রক্ষা পাওয়া, কোথাও আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। এরকম আরও অনেক ঘটনাই ঘটছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কি জিনিস, সেটাও প্রতিপক্ষ মহিলা প্রার্থীকে প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে মার দিয়ে দেখানো হল। ম্যাডাম মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন নীরবতার কৌশল নিয়ে! সব 'সাজানো ঘটনা'! সব 'ষড়যন্ত্র'! সব সরকারকে 'অপদস্থ' করার অভিযোগ!

মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঔদ্ধত্যের সাথে শুনিয়ে রেখেছেন এ রাজ্যে নারী সমাজের ওপর উৎপীড়ন দেশের সমস্ত রাজ্যের পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বলে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর অভিযোগ তাঁরা মানছেন না। জাতীয় নারী কমিশনের হুবহু বক্তব্যও বর্তকান সরকার মানতে রাজী নন। উপরন্তু যেমন, কামদুনির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পেছনে 'মাওবাদী' ষড়যন্ত্র 'আবিষ্কার' করছেন, কামদুনিবাসীদের বিচার চাইতে রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার মধ্যে 'নাটক' দেখছেন। অন্যদিকে ধর্ষণের ও ধর্ষিতাকে হত্যার প্রতিটি বিচার প্রক্রিয়াকে প্রতারণা ও প্রহসনের শিকার করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি কেসেই মূল অভিযুক্ত বা কোনও কোনও অভিযুক্ত থাকছে অধরা, সহজে রিপোর্ট-চার্জশীট তৈরী হচ্ছে না, সরকারি কৌসূলীদের ভূমিকা যথেষ্ট সন্দেহজনক। সরকার, মন্ত্রী, পুলিশ, প্রশাসন 'আইন আইনের পথে ...' বলেই নিস্পৃহ। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আর দ্রুত বিচারের প্রতিশ্রুতির আওয়াজ নেই। নামেই চলছে 'ফাস্ট ট্রাক কোর্টে' বিচার, কার্যত সমস্ত বিচারকেই যেন অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে বহু বিলম্বিত করা হয়রানির প্রক্রিয়ায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মিলছে সরকারের আচরণগত প্রতিক্রিয়ার দর্পণে, তথাকথিত 'পরিবর্তনের' স্বঘোষিত দাবিদার সরকারের কোন বিচলিত হওয়ার লক্ষণই নেই। তাঁরা এখন তাঁদের আসন্ন পঞ্চায়েতরাজের পথে থাকা অবশিষ্ট কাঁটা নির্মূলীকরণের অভিযানে উন্মত্ত।

রাজারহাটে আবাসনের মালিক যুগল এবং তাদের আইনজীবী, পুলিশ বন্ধুরা ফুঁসলে নিয়ে আসা তরুণীকে গৃহবন্দী করে রেখে যৌন শোষণের পরিচারিকা বানিয়েছিল। ওদের দুঃসাহস বেড়ে যায় এই তথ্য জেনে যে, তরুণীটির সৎবাবা ও জন্মদাত্রী মায়ের কাছে ফেরার কোনও রাস্তা নেই। কারণ, ওরাই তাকে তুলে দিয়েছে রাজারহাটের আবাসিক পিশাচদের হাতে; যারা 'ভালভাবে রাখা'র ছলে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তরুণীটি তার ওপর কেতাদুরস্ত সমাজের লাম্পট্যের লাগাতার নিগ্রহ ভোগ করতে শুরু। ভদ্রবেশী শয়তানের দল তাদের কাম চরিতার্থ করেই সন্তুষ্ট হওয়ার নয়, তারা তরুণীটিকে মধুচক্রের দেহব্যবসায়ও নামাতে চেয়েছিল। তরুণীটি বাঁচতে বারবার পালাতে চেয়েছে, কিন্তু নিগ্রহকারীরা প্রত্যেকবারই তাকে ধরে এনে বন্দী করে রাখত। অবশেষে পাখী খাঁচা ভেঙ্গে পালাতে পেরেছে, তবেই জানা সম্ভব হল সবকিছু। নির্যাতিতা তরুণী থানায় অভিযোগ জানালেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট টালবাহানা দেখিয়েছে। নির্যাতনকারী আবাসিক মালিক চূড়ামণিদয় পালিয়ে যাওয়ার সময়-সুযোগ পেয়েছে, চাপ প্রবল থাকায় পুলিশ অভিযুক্ত এক আইনজীবীকে ধরতে পাঁচদিন লাগিয়ে দিয়েছে, আরেক অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে ধরার নাম নিচ্ছে না। সরকার এবং শাসকদল নির্বিকার। অনুমান হচ্ছে, অভিযুক্তদের সাথে পুলিশ, প্রশাসনের অনেক কেষ্টবিষ্টুদের সখ্যতা রয়েছে। অভিযুক্তরা সেই ভীতিও তরুণীকে দেখাতো। অতএব, বুঝে নেওয়ার অপেক্ষা রাখে না তাদের যৌন উৎপীড়ন চালানোর শয়তানির জাল কত বিস্তৃত, কত গভীরে।

ভূয়ো সংঘর্ষে ইশরাত জাহানের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসা'র সভা

যাদবপুর আইসা ইউনিটের উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ল্ড ভিউতে দুপুর ১টায় সভা আয়োজিত হয়। এই কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করে। আইসার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেড দেবমাল্য হালদার, আইপোয়া (প্রগতিশীল মহিলা সমিতি)-র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেড চন্দ্রাস্মীতা চৌধুরী। সঙ্গীত ও চিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে ওয়ার্ল্ড ভিউ। একক নাটক পরিবেশন করেন লিবারেশন. আর্ট-এর কর্ণধার অঞ্জন রায়।

সভা থেকে আওয়াজ ওঠে—''ইশরাত জাহান হত্যার বিচার চাই'', ''কর্পোরেট ফ্যাসিজম নিপাত যাক'', ''অপারেশন গ্রীণহান্ট বন্ধ করো''।

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ
আজকের দেশব্রতী পড়ুন

মোদীর বাণী হল ভারতে সাম্প্রদায়িক, কর্পোরেট মদতপুষ্ট ফ্যাসিবাদের কণ্ঠস্বর

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে—যেটি ছিল বিজেপির প্রচার কমিটির প্রধান হওয়ার পর তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার—এবং তারপর এক ভাষণে নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে এমন চূড়ান্ত মাত্রায় প্রকাশ করে দিয়েছেন যেটা বিরোধীপক্ষের কোন রাজনীতিবিদের পক্ষে সম্ভব হত না। মোদীর ভাবমূর্তি নির্মাতারা দাবি করে থাকেন যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনেক ওপরে থেকে মোদী হলেন 'উন্নয়ন'-এর নায়ক। তবে মোদী কিন্তু নির্লজ্জভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ও হিংসা তাঁর মনে আঁকা চিত্রকল্প, উপমা ও তাঁর রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

গুজরাটে ২০০২ সালে মুসলিমদের গণহত্যা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে মোদী 'কুত্তার বাচ্চা' উপমাটি ব্যবহার করেন (হিন্দিতে যেটি একটি বহুল ব্যবহৃত গালাগাল)। এই উপমাটির ভয়ঙ্কর গূঢ়ার্থ আমাদের কাছে ধরা না পড়ে পারে না। গুজরাটে ২০০২ সালে সংঘটিত গণহত্যাকে গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা যাওয়া কুকুরের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করে মোদী ঐ গণহত্যাকে তুচ্ছ করে তুলছেন এবং ঐ গণহত্যার শিকার যে সমস্ত মানুষ ন্যায়বিচার চাইছেন তাদের তিনি উপহাস করছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর 'হিন্দু রাষ্ট্রে' মুসলিমদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হলে—যাদের হত্যা করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় যাতে মোদীর গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা, পুলিশ অফিসাররা এবং তিনি নিজেই জড়িত, অথবা 'সাজানো সংঘর্ষে'—তার পরিণাম চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে 'দুর্ঘটনায়' মারা যাওয়া কুকুরের বাচ্ছার মতই হবে।

ঐ সাক্ষাৎকারে মোদী নিজেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলে ঘোষণা করেছেন; আর সেটা হল একজন হিন্দু ও একজন জাতীয়তাবাদী হওয়ার ফল। এই যুক্তিধারা পুরোপুরি ভ্রান্ত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ও তারপরও এমন অনেক হিন্দুকেই দেখা গেছে যাঁরা ছিলেন মনেপ্রাণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কিন্তু তাঁরা 'হিন্দু রাষ্ট্র'র যে কোন ধারণাকেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। হিন্দু রাষ্ট্র সর্বদাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ফ্যাসিবাদী কল্পনার খোয়াবের বস্তু হয়ে থেকেছে, যে সংঘেরই এক গর্বিত ফসল হলেন মোদী।

ঐ একই সাক্ষাৎকারে মোদী স্বৈরতন্ত্রকে এক 'চূড়ান্ত নেতা'র গুণাবলীর সমতুল্য বলে বলেছেন। 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর ওকালতি করা থেকে স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করা, মোদীর এই বাচনিকতা হল কর্পোরেট ধারায় ফ্যাসিবাদী ধ্যানধারণাকে বিকোনোর নির্লজ্জ ও উদ্ধত প্রয়াস। বিজেপি যেমন দাবি করছে তার বিপরীতে, মোদীর কথাকে তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিকৃত করা হচ্ছে না; তিনিই বরং ভারতের এমন বিকৃতি সাধন করতে চাইছেন যার সঙ্গে তাঁর ফ্যাসিবাদী মডেল খাপ খেয়ে যাবে, যার বৈশিষ্ট্য হবে গণহত্যা, মিথ্যা সংঘর্ষে হত্যা ও লাগামহীন কর্পোরেট লুণ্ঠন।

'কুত্তার বাচ্চা' উপমা ব্যবহার করার পরপরই মোদী 'বোরখা' উপমাটিও ব্যবহার করেন এবং বলেন, কংগ্রেস 'বোরখার' ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তার ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখছে। 'বোরখা' উপমাটির ব্যবহার ('পরদা' শব্দটির বদলে যেটি হিন্দু ও মুসলিম সবাই ব্যবহার করে থাকেন) সংখ্যালঘু মুসমিলদের উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে ব্যবহৃত এক বিদ্রুপ। উপমাটি ব্যবহারের লক্ষ্য হল সেটিকে মুসলিমদের সঙ্গে একাকার করে দিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে অবজ্ঞার উদ্রেক করা। মোদী 'সদভাবনা' ও 'সর্বাগ্রে ভারত'-এর যে হাবভাব করছেন তা এই বিষয়টাকে আড়াল করতে পারবে না যে, 'মুসলিম' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে ধারণা 'কুত্তার বাচ্চা' ও 'বোরখা'র সঙ্গে যুক্ত। মোদী ধর্মনিরপেক্ষতাকে যতই বর্জনীয় এক আবরণ বলে মনে করুন না কেন, ভারতের অস্তিত্ব ও প্রগতির জন্য এটা কিন্তু অপরিহার্য এক উপাদান। কংগ্রেস বলছে, নগ্ন সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে 'বোরখা'র ধর্মনিরপেক্ষতাই তাদের পছন্দ। কংগ্রেস এইভাবে বিজেপির সঙ্গে সহমত পোষণ করছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এক মৌলিক বিষয় হওয়ার চেয়ে বাহ্যিক রূপেরই এক বিষয়। তবে, আধুনিক ভারতের মর্মবস্তুর এক দিক হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা আপামর গণতান্ত্রিক জনগণের কাছে এমন এক বিষয় যা নিয়ে কোন আপোষ চলতে পারে না।

বিজেপির জীবনে পূর্ববর্তী এক পর্যায়ে আদবানির ওপর দায়িত্ব বর্তেছিল সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী ঘৃণার বক্তৃতাগুলো দেওয়ার, আর বাজপেয়ী ছিলেন 'মুখৌটা'—যা হল 'প্রশাসনিক' মুখোশ, অথবা সেই আবরণ যার ভিত্তিতে জে ডি (ইউ)-র মত মিত্ররা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে পারে। তখনও কিন্তু 'মুখোশটা' এক প্রহসন হয়েই দেখা দিয়েছিল এবং আদবানি ও বাজপেয়ী দুজনেই ছিলেন একই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী মুদ্রার দুই দিক। আজ মোদী ঐ দুই ভূমিকা একাই পালন করতে চাইছেন ঃ একদিকে তিনি সাম্প্রদায়িক হিংসা, মিথ্যা সংঘর্ষে হত্যা ও ঘৃণার বক্তৃতাগুলো নিয়ে নির্লজ্জ আস্ফালন করে মূল হিন্দুত্ববাদী সমর্থনভিত্তিকে তুষ্ট করতে চাইছেন, অন্যদিকে 'উন্নয়ন' ও 'প্রশাসনের' প্রতিনিধি হওয়ার হাবভাবও করছেন।

প্রথম শ্রেণীর এক সংবাদপত্র মোদীকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর সংযোগের ধারাকে 'উন্নত করেন' এবং কুত্তার বাচ্চার উপমার মত 'বেফাঁস মন্তব্যকে' পরিহার করেন, সংবাদপত্রটির মতে যা 'অসংবেদী' ও 'জঘন্য'। মোদীর 'কুত্তার বাচ্চা' ও 'বোরখা'র উপমা কোন 'বেফাঁস মন্তব্য' নয়—ওগুলো তাঁর সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী মানসিক ধাঁচ ও এজেণ্ডার মর্মস্থলে রয়েছে, 'উন্নয়ন'-এর কোন মুখোশই যেটাকে আড়াল করতে পারবে না। কর্পোরেট ক্ষেত্রের মোদীর শুভাকাঙ্খীরা এবং যশোবন্ত সিনহার মত বিজেপির নেতারা এটা খুব ভালো করেই জানেন। এ সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন তাঁর ভাষা ও অভিপ্রায়কে এমনভাবে ঢেকে রাখেন যাতে করে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উতরে যান, শুধুই 'হিন্দুত্ববাদী হৃদয়সমূহের সম্রাট' রূপে যেন দেখা না দেন। যশোবন্ত সিনহার মত ব্যক্তিরা—যাঁরা সম্ভবত 'চিন্তার আদবানি ঘরানার' প্রতিনিধিত্ব করেন—এই ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন যে, মোদী কংগ্রেসের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন এবং সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মনিরপেক্ষতার বিতর্কে জড়িয়ে গিয়ে প্রশাসন ও দুর্নীতির মত বিষয়গুলোকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছেন। কিন্তু ঘটনা হল, যে কোন গণতন্ত্রেই প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা তুচ্ছ ব্যাপার হতে পারে না। এবং মোদী—কংগ্রেসের মতই—কর্পোরেট লুণ্ঠনের মত প্রশ্নগুলো থেকে দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে চান, প্রতিটি বিরাটাকায় আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে কেলেঙ্কারিগুলোতে মদত যুগিয়েছে ইউ পি এ সরকার এবং কংগ্রেস ও বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলো।

একদিকে এক কট্টর সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেট-সমর্থিত ফ্যাসিবাদী এবং অন্যদিকে এক দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরতান্ত্রিক জমানা যার কাছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' তার সমস্ত অপরাধকে আড়াল করার লক্ষ্যে এক অবজ্ঞাময়, সুবিধাবাদী ছুতো—লোকসভা নির্বাচনকে এই দুই বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে পরিণত করার বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রচেষ্টাকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১৬ জুলাই ২০১৩)

এক বেয়াদপ সরকার ও নিধিরাম কমিশন

হিংসার উন্মত্ত পশ্চিমবাংলা আজ যেন এক বধ্যভূমিতে অধঃপতিত হয়েছে। শাসকদলের লাগামছাড়া হিংসায় রাজ্যের নানা প্রান্তে পঞ্চায়েত নির্বাচনের চতুর্থ দফায়ও একের পর এক মৃত্যু—বাড়ী-ঘরদোর আগুনে ভস্মীভূত, পুরুষ মানুষেরা এলাকা ছাড়া; কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু; সন্ত্রাস-হুমকির আবহে বিরোধীপক্ষের শেষ প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে কোথাও কোথাও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে মিথ্যা খুনের মামলায় প্রার্থী সহ স্থানীয় নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার—রক্তপাতময় পথে এইভাবেই অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন! ঘটে যাওয়া এই নজীরবিহীন হিংসা ও সন্ত্রাস এখন আর কোন পক্ষই অস্বীকার করতে পারছে না—রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল, নির্বাচন কমিশনের প্রধান, এমনকি প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীও! কিন্তু এত খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের **দায় কার**—এই নিয়েই চলছে চাপান-উতোর। রাজ্য সরকার তা চাপাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ও বিরোধী দলগুলোর ওপর, আর অত্যন্ত মিনমিন কণ্ঠস্বরে নির্বাচন কমিশন ঘুরিয়ে (সরাসরি নয়) রাজ্যকেই এ ব্যাপারে দোষারোপ করছে। আর সাংবিধানিক প্রধানের প্রসাধনী পদে আসীন রাজ্যপাল 'আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারেরই', তা শুধু স্মরণ করানোর কাজটি করেছেন সুবোধ বালক গোপালের মত।

অথচ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অবাধে যাতে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য কত 'উদ্বেগ'ই না লক্ষ্য করা গেছিল। এমনকি, মেয়াদোত্তীর্ণ পঞ্চায়েতে দ্রুততার সঙ্গে নির্বাচন করে যাতে সাংবিধানিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তার জন্য বিভিন্ন স্তরের আদালতের মধ্যেও দেখা গেছিল কত তৎপরতা ও আকুতি! সাংবিধানিক সংকট থেকে পরিত্রাণ বনাম অবাধে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োগ—সংবিধান প্রদত্ত এই দুই অধিকারের দ্বন্দ্বের মধ্যে শেষোক্তটির পুরোপুরি লঙ্ঘনের বিনিময়ে প্রথমোক্তটি প্রতিষ্ঠিত হল। এটাই বিচার বিভাগের কাছে যেন অসীম এক তৃপ্তি। সান্ত্বনা। নির্বাচন কমিশন বনাম রাজ্য সরকারের চলতে থাকা মামলায় দফা বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জট খুললেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে পুরোপুরি পাশ কাটালো আদালত—আর তা হল, নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকে নতুন নির্বাচিত পঞ্চায়েত গঠনের বিজ্ঞপ্তির মাঝের পর্বে পুলিশ-প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার থাকবে—নির্বাচন কমিশন না রাজ্য সরকারের—তা ফয়সালা করা হল না। গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিজের সংবিধান প্রদত্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন যেন শেষ পর্যন্ত বেছে নিল নিজের ঠুঁটো অস্তিত্ব; নিষ্ক্রীয় দর্শকের ভূমিকা! যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যতীত পঞ্চায়েত নির্বাচন করা বাস্তবে কিছুতেই সম্ভব নয়, আপাত এমনই এক কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা কোন পর্যায়ে কার্যকরী করতে পারল না নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার নির্বাচনে 'বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষ ছাড়া' শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে, রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন এ প্রশ্নে সহমত হল। আর রাজ্যপালও তড়িঘড়ি সব পক্ষকে প্রথম পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বাহবা দিয়ে বসলেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যেভাবে নিষ্ক্রীয় করে রেখে দেওয়া হল, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ইউনিফর্ম পরে রাজ্যের হোমগার্ড যে কদর্য 'ইচ্ছেমতো সাজো'র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল, নির্বাচন কমিশনের চোখে তা ধরা পড়ল না। এমনকি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহারের কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও নাকি নির্বাচন কমিশনের কাছে জানা ছিল না এমন অর্বাচিন, মন্তব্য ও অপেশাদারিত্ব লক্ষ্য করা গেল।

প্রশাসনকে নিজের আওতায় রেখে রাজ্য সরকার যা খুশী তাই করেছে। গোটা নির্বাচনী প্রচার পর্বে খোদ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক রাঘব বোয়াল ও চুনোপুঁটি নির্বাচনী বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য ভাষায়, প্রকাশ্য জনসভা থেকে যে হুমকি ও সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে, তার সামনে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে পড়ল। কেবল বক্তৃতার সিডি চেয়ে পাঠানো বা শেষ পর্যন্ত 'আইনি পদক্ষেপ' নেওয়ার সুপারিশ করেই নির্বাচন কমিশন পালন করল তার বহু ঢক্কানিনাদিত সাংবিধানিক দায় ও কর্তব্য! বাইক বাহিনীর প্রতি হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞাও ছেঁড়া কাগজে পরিণত করল প্রশাসন। মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে, সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অঙ্গীকার করে তৃণমূল সরকারটি ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তাকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও, এক বেপরোয়া, বেয়াদপ রাজ্য সরকারকে কোনভাবেই সংযত করতে পারল না বিচারবিভাগ থেকে শুরু করে অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষের প্রাণের যেন কোন মূল্যই নেই এই রাজ্য সরকারের কাছে। প্রকাশ্য জনসভায় শাসকদলের নির্বাচিত এক বিধায়ক বিরোধী নেতার মুণ্ডু কেটে নেওয়ার হুমকি দেয়। আর আইন-আদালত, নির্বাচন কমিশন তার বিরুদ্ধে ন্যূনতম আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু না করে বসে থাকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত।

একটি নির্বাচিত সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক বা ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র তার সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যেই তৈরি করে রেখেছে কিছু রাশ টেনে ভারসাম্য বজায় রাখার (চেক্স অ্যাণ্ড ব্যালান্সেস) আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা। নির্বাচন কমিশন যেমন রয়েছে, তেমনি আছে মানবাধিকার কমিশন, নারী কমিশন প্রভৃতি হরেক স্বশাসিত সংস্থা। রাজ্য সরকারের বা তার প্রশাসনের অসাংবিধানিক, নিয়মবর্হিভূত বা বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ওয়াচ ডগ বা প্রহরী হিসাবে ঐ সমস্ত সংস্থাগুলো কাজ করে। কিন্তু সংবিধানই আবার তাদের ক্ষমতাকে এতই সীমায়িত, খণ্ডিত করেছে যে অনেক সময়ে তাদের কার্যকরিতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। এ রাজ্যে নারী নির্যাতনের মতো নিত্যদিনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা আজ কাঠগড়ায়। কিন্তু রাজ্য নারী কমিশনের তরফ থেকে সেই সমস্ত অঞ্চলে আক্রান্ত মানুষ বা আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবারের কাছে গিয়ে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করতে দেখা গেল না। পুলিশ-প্রশাসনের সন্দেহজনক আচরণ গিয়ে টুঁ শব্দটি করল না রাজ্য নারী কমিশন। রাজ্য সরকারের পুরোপুরি পেটোয়া হয়ে পড়লে স্বশাসিত একটি কমিশন কীভাবে তার কার্যকারিতা হারায়, এটা হল তারই এক নির্লজ্জ নিদর্শন। কিন্তু আরেকটি সংস্থা এ রাজ্যে রয়েছে—রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ঘটানো মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এই কমিশনটি অহরহ অত্যন্ত ইতিবাচক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ রেখে চলেছে লাগাতারভাবে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে তদন্তও করেছে। এমনকি, নজীরবিহীনভাবে, শিলাদিত্য কাণ্ডে সম্প্রতি ২ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের সুপারিশ ও মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি সমালোচনা ও সতর্ক করে ২০ পাতার একটি রিপোর্টও প্রকাশ করেছে। এর আগে কার্টুন কাণ্ডেও দোষী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করেছিল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। আরও অনেক সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে করলেও হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ঘটনায় তা সরাসরি খারিজ করেছে রাজ্য সরকার। এ রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কী ব্যাপকভাবে ঘটছে, তার একটি পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যাক। ২০ জুলাই দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, **"২০১১-১২ সালে ৫,৪৫৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়; যার মধ্যে ৩৩টি ক্ষেত্রে সুপারিশ (সরকারের কাছে) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ২০১২ এবং ২০১৩-র মধ্যে অভিযোগের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৯,৪১৫ সংখ্যায় পৌঁছায়। আর, এ ক্ষেত্রে ৭৫টি সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ৭২৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে।"** মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ রাজ্য সরকার না মানলে হাইকোর্টে আপীল করা ছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা অভিযোগকারীর থাকে না। অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ঐ জটিল আইনী আবর্তে তাই সহজেই কেউ যেতে চান না। ফলে কমিশনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

সাধারণ সময়ে, সংসদীয় গণতন্ত্রের বাগানে পল্লবিত হয়ে ওঠা ঐ সমস্ত স্বশাসিত কমিশন যতই দৃষ্টি নন্দন হোক না কেন, সংকট মুহূর্তে বা কমিশন ও সরকারের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র দাঁড়ায় সরকারের পক্ষেই—সে সরকার যতই বেয়াদপ, বেয়াড়া হোক না কেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের মহিমা বাড়াতে ঐ সমস্ত সংস্থাগুলোর অস্তিত্ব নিছকই প্রসাধনী। সরকারকে সবক শেখাবার জন্য নয়। সরকারকে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে একমাত্র সমুচিত শিক্ষা দিতে পারে জনগণের জাগ্রত শক্তি। ইতিহাসই বারবার সেই সাক্ষ্য বহন করেছে।

- অতনু চক্রবর্তী

স্থায়ী বঞ্চনার শিকার চা শ্রমিকরা

চা বাগান শ্রমিকরা আজ বঞ্চিত। আমাদের দেশে প্রধানত ৪টি রাজ্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরলে চা উৎপাদন হয়। আমাদের রাজ্যে দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে ছোট বড় মিলিয়ে ৪৫০টির মত চা বাগান আছে। প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করেন। এদের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষের মত।

বিগত ১০০ বছর ধরে চা উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত প্রথম স্থানে ছিল। ২০০৫ থেকে চীন প্রথম ও ভারত দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়। শ্রীলঙ্কা ও কেনিয়া যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ২০১১ সালে মোট টার্ণ ওভার ছিল ১৯,৫০০ কোটি টাকা। উৎপাদনের ৮০ শতাংশ দেশীয় বাজারে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও ২০০৯-এ চা রপ্তানিবাবদ ৯ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে প্যাকেট ব্র্যাণ্ড চা নতুন করে বাজার তৈরি করেছে। ইণ্ডিয়ান টাটা কোম্পানি, লিপটন সহ বেশ কিছু কোম্পানি লাভের মুখ দেখেছে। এই কোম্পানিগুলো প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা লাভ করেছে। তথাপি এখানকার চা শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ।

বাগানে মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকরা কাজ করেন। মহিলা শ্রমিকরা প্রধানত পাতা তোলার কাজ করেন। পুরুষ শ্রমিকরা বাগানের তদারকি, মাল বহন, বাগান স্প্রে করা এবং কারখানার উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। মহিলা শ্রমিকরা পুরুষদের থেকে কম মজুরি পেয়ে থাকেন। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ও তাদের কাজ করতে হয়। শুধু তাই নয়, প্রসবকালীন সমস্ত সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১, বারে বারে লঙ্ঘিত হয়েছে। ক্রেশ, মেডিকেল সুবিধা, অ্যাম্বুলেন্স, ঘর তৈরির ব্যবস্থা, জ্বালানি কিছুই বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। মজুরি অত্যন্ত কম, তার ওপর ২০০৫ সালে উৎপাদন ভিত্তিক মজুরি চুক্তি হয়েছিল। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় উৎপাদন দিতে না পারলে মজুরি কাটা যেত। মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে, পঞ্চদশ ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স (আই এল সি)-র নির্দেশও মানা হচ্ছে না। ইউনিয়নগুলো ডি এ ১০০ শতাংশ নিউট্রালাইজেশনের দাবি করেছে। শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পরিমাণ ৬৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীরবতা পরোক্ষভাবে মালিকদের সহযোগিতা করছে।

সুপ্রীম কোর্ট আগস্ট, ২০১০ কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে বাগানগুলো ৬ মাসের অধিককাল ধরে বন্ধ হয়ে আছে, ১৯৫৩-র প্ল্যান্টেশন আইনের সাহায্যে সেগুলো অধিগ্রহণ করতে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ক্লোজারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশকেও কার্যকর করেনি।

চা শিল্পে সংকট মারাত্মক আকার নিয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে। মালিকরা অভিযোগ জানায় অতিরিক্ত শ্রম সংকুচিত বাজার, জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এর জন্য দায়ী। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের পর্যবেক্ষণ ৭০-৯২ চায়ের দাম ৪৪ শতাংশ কমেছে ঠিকই, কিন্তু সংকটের প্রধান কারণ এটা নয়। আসলে বাগিচা মালিকরা লাভের টাকাকে পুনরায় বিনিয়োগ না করে পুঁজি অন্যত্র পাচার করে। শুধু তাই নয়, আধুনিকীকরণে তাদের অনাগ্রহ ও ঔদাসীন্যও চা শিল্পকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৪টি বাগান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ১৪টি বাগান ২০০৭ থেকে অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (ও এম সি) চালাচ্ছে। ও এম সি গঠিত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন ও স্থানীয় সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ টি ফাণ্ড চালু করায় বাগানগুলো কিছুটা আর্থিক সহায়তা পায়। কিন্তু বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাপক হারে অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে। প্রায় ১৫০০ শ্রমিক চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। সামর্থ্য ঘাটতি লেভেল ৩-এ পৌঁছেছে। বন্ধ কারখানার ভাতা অধিকাংশ শ্রমিক পাননি। বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকদের অনুপাত ১ ঃ ৩। অস্থায়ী শ্রমিকরা বন্ধ কারখানার ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বহু টালবাহানার পর ২০১১-তে তিন বছরের মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবারের চুক্তিতেও বেসিকের সাথে ডি এ-কে যুক্ত করা হয়নি। চুক্তির পূর্বে মজুরি ছিল দৈনিক ৬২ টাকা, চুক্তির পর বেড়ে হয়েছে—প্রথম বছর ৮৫ টাকা, দ্বিতীয় বছর ৯০ টাকা এবং তৃতীয় বছর ৯৫ টাকা। পাহাড়ে পৃথকভাবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, এখানে শ্রমিকরা তিন বছর টানা ৯০ টাকা করে মজুরি পাবেন।

বাগানে ৩২টি নথিভুক্ত ইউনিয়ন আছে। এর মধ্যে কয়েকটি আবার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো যৌথভাবে পঞ্চদশ ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স (আই এল সি)-এর সিদ্ধান্তকে কার্যকরি করা, সুপ্রীম কোর্টের ২০১০ সালের আগস্টের নির্দেশ মানা, ডি এ সহ অন্যান্য দাবিতে সোচ্চার হয়েছে।

১৯৯০ সাল থেকে বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের বেঁচে থাকার কোন সম্বল ছিল না। অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকের না ছিল কাজ, না ছিল জমি। এদিকে ৩৭০ কোটি টাকা মজুরি, বেতন, পি এফ, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি বকেয়া আছে যা শ্রমিকদের অর্জিত প্রাপ্য।

শ্রমিকদের বাঁচার জন্য নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী হয়ে উঠেছে। বকেয়া পি এফ নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ আছে, এতে শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।

চারের পাতায় দেখুন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শতায়ু বামপন্থী নেতা কমরেড সমর মুখার্জী স্মরণে

প্রবীণ বামপন্থী নেতা কমরেড সমর মুখার্জীর প্রয়াণ সংবাদ পেয়ে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য কমরেড অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী ও কমরেড রূপো—তিনজনের প্রতিনিধিদল সি পি আই (এম)-এর রাজ্য অফিসে যান। কমরেড কার্তিক পাল প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রতিনিধি দলের অন্য দুই কমরেড। প্রয়াত কমরেডের প্রতি সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষ থেকে কমরেড কার্তিক পালের স্বাক্ষর সম্বলিত এক শ্রদ্ধাঞ্জলিপত্রে বলা হয়—

''সি পি আই (এম) পার্টি গঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য, কন্ট্রোল কমিশনের দায়িত্বশীল, সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এবং এই রাজ্যে উদ্বাস্তু আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা প্রবীণ কমরেড সমর মুখার্জী আজ বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের পার্টি গভীরভাবে শোকাহত। শতায়ু বামপন্থী নেতার দীর্ঘ জীবন কেটেছে পার্টি কমিউনে। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বামপন্থী আন্দোলনের সামনের সারির নেতা ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস সমগ্র বামপন্থী কর্মী ও জনগণের কাছে শিক্ষণীয়। কমরেড সমর মুখার্জীর মৃত্যুতে সি পি আই (এম) পার্টি ও বামপন্থী পার্টিগুলির শোকের সাথে আমাদের পার্টি সমানভাবে সমব্যথী।''

বরুণ দে (১৯৩২-২০১৩)

ইতিহাসের প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক সুশোভন সরকার পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাসবিদ হয়ে ওঠার জন্য যে বীজ রোপন করে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতে অনেক ইতিহাসবিদই তাঁর যথার্থ এবং যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে উঠতে পেরেছেন। তারই এক অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বরুণ দে প্রয়াত হলেন গত ১৭ জুলাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাসে পার্থসারথী গুপ্ত এবং বিনয় চৌধুরী, অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেন ও সুখময় চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে অক্সফোর্ডে তিনি গবেষণা করেছিলেন—'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্নিহিত রাজনীতি ও কোম্পানির নীতি নির্ধারণে লর্ড ডানডাস-এর ভূমিকা।'

ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর বরুণ দে অধ্যাপনা করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে। কিন্তু শুধুমাত্র অধ্যাপক হিসাবেই তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না—তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন ইতিহাসবিদই শুধুমাত্র নয়, কলকাতার একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকর্তা হিসেবেও। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স এবং পরবর্তীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিকর্তা। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান।

কলেজে পড়াকালীন সময়কাল থেকেই মাস্টারমশাই সুশোভনবাবুর প্রভাবে তিনি বস্তুবাদী ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সারাজীবন ধরেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভাবে তো বটেই, প্রত্যক্ষ মতাদর্শগত তাত্ত্বিক প্রেরণা হিসেবে মার্কসীয় ইতিহাস ভাবনাই তাঁর যাবতীয় রচনার ভিত্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিদেশে থাকার সময় তিনি তখনকার প্রখ্যাত মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের সংস্পর্শ এত বেশী পছন্দ করতেন যে তাঁর বাড়ী থেকে নির্দেশ ছিল তিনি যেন সেখানে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করেন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন। তিনি পরবর্তীতে লিখেছেন যে তিনি পড়াশুনোও করেছেন—একইসঙ্গে সরাসরি সংযোগ বজায় রেখেছেন মার্কসবাদীদের সঙ্গেও।

দেশে প্রত্যাবর্তন করার পরেও সক্রিয় থেকেছেন সুশোভন সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন 'মার্কস ক্লাব'-এর সঙ্গে। সুশোভন সরকারের জীবিত থাকাকালীন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সুশোভন সরকার সম্মাননা গ্রন্থ'। এই ধরনের গ্রন্থ যে উচ্চমানের সম্পাদনা ও গ্রন্থনা দাবি করে তার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা বজায় রাখতে তিনি পেরেছিলেন। তাঁর অন্যতম গবেষণা ও লেখালেখির বিষয়বস্তু ছিল ভারতের অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকট ও সেইসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রেঁণেসাঁ। বাংলার 'পুনর্জন্ম' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—''বাংলার রেনেসাঁ সম্পর্কে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী আছে। একটির মতে, এই রেনেসাঁ ছিল মূলত সার্থকনামা ও সফল। অন্যটির মতে, এই রেনেসাঁ ছিল মূলত একটি আরোপিত ব্যাপার, এদেশের সমাজ বাস্তবতা থেকে, সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে, আলো-জল-হাওয়া থেকে এই রেনেসাঁ উৎসারিত হয়নি। যদি এইভাবে উপস্থাপিত করা হয়, তবে আমি দ্বিতীয় মতটিকেই সমর্থন করবো।'' উক্ত প্রবন্ধটি এবং এই বিষয়েই তাঁর রচিত আরও দুটি ইংরেজী প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধগুলো পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তিতে, বিশ্লেষণের গভীরতায় ও স্বচ্ছ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের এক দৃষ্টান্ত।

মধ্য সত্তর দশকের শেষার্ধে সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় চীনের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ যজ্ঞ সংক্রান্ত এক বিতর্কে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা চীনের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। অসামান্য সাংগঠনিক প্রতিভা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর গড়ে তোলা 'সেন্টার' আজও পর্যন্ত পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা সমাজবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। এটা করাতে তিনি কলকাতার বিদ্যুৎ সমাজের এক সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছেন। পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদদের মধ্যে তাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সুমিত সরকার, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, জ্ঞান পাণ্ডে, মুজফফর আলম, তনিকা সরকার, সুরঞ্জন দাশ প্রমুখেরা। প্রথম জীবনে পদার্থ বিদ্যার ছাত্র, পরবর্তীতে ম্যানেজমেন্টের এক উজ্জ্বল ছাত্রের নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস গবেষণায় নিয়ে আসা এবং ভবিষ্যতের একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে গড়ে তোলাটা বোধহয় একমাত্র বরুণ দে-র পক্ষেই সম্ভব ছিল।

একই সঙ্গে অধ্যাপক, গবেষক, অভিভাবক, সুরসিক ও ভোজনরসিক এই বহুমাত্রিক মানুষটির স্মৃতি ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক ও বিদ্যুৎ সমাজের কাছে চিরজাগরুক হয়ে থাকবে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স কর্তৃক আয়োজিত স্মরণসভায়।

- অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

মিড-ডে মিল ট্র্যাজেডি ও আশঙ্কার নানা মাত্রা

১৬ জুলাই মিড-ডে মিল খেয়ে বিহারে ২২ জন মারা গেল সারান জেলায়। খাদ্যে তীব্র বিষক্রিয়ার কারণ নিয়ে প্রাথমিক অনুমান কোনও কীটনাশক খাদ্যে মিশেছিল। এই লেখার সময় খাদ্যের নমুনা নিয়ে কলকাতার ফরেন্সিক ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তদন্তেই জানা সম্ভব ঠিক কী কী ধরণের গাফিলতি এই মারাত্মক ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সারানের ঘটনার পরদিন আরও ১৫ জন শিশু মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল বিহারের আর এক জেলা মধুবনিতে। একইদিনে মহারাষ্ট্র থেকেও একইরকম আতঙ্কজনক খবর এল। খবরের কাগজে, টিভি চ্যানেল আর ইন্টারনেটে এই খবরগুলো দেখতে দেখতে পড়তে একটা আতঙ্কের স্রোত বয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে। শুধু সামাজিক জীব হিসেবেই নয়, একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেও। জীবিকার সূত্রে আমি যে স্কুলে পড়াই সেখানে ঘটনাচক্রে মিড-ডে মিল কার্যক্রমের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত থাকার সুবাদে জানি দুর্ভাগ্য সমস্ত সতর্কতার অতীত, এ কথা মনে রেখেও বলা যায়, মিড-ডে মিল ব্যাপারটা যেভাবে চলে, সেটা বেশ দুর্ঘটনা প্রবণ। অনেক বেশি করেই হয়ত ঘটে যেতে পারে এরকম মারাত্মক ঘটনা, ঘটে না যে সেটাই আমাদের সৌভাগ্য। বিশ্বাসী কেউ কেউ এমনকি দৈবও বলতে পারেন।

কেন বলছি এরকম কথা সেটা পরিষ্কার করতে গেলে এই প্রকল্প কীভাবে চলে তার দৈনন্দিনতায়, সেটা স্পষ্ট করতে হবে। তবে তার আগে প্রথমেই এটা বলে রাখা ভালো সাধারণ বিচারে 'মিড-ডে মিল প্রকল্প' সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্প। এই প্রকল্প চালুর আগে আমাদের স্কুলে দেখতাম অনেক ছাত্রছাত্রীই মাঝপর্বে বা শেষপর্বে বেশ নেতিয়ে পড়েছে। কারও মাথা ঘুরছে, কারও বমি পাচ্ছে। প্রশ্ন করে জানা যেত, তারা অনেকে বাড়ি থেকে খেয়ে আসেনি, হয়ত মুড়ি বাতাসা বা সামান্য কিছু খেয়েছে। স্কুলে পেটভরা/পুষ্টিকর টিফিন খাওয়ার প্রশ্ন নেই, কারণ মারাত্মক দারিদ্র। তার চেয়েও বড় কথা বাবা সকালে কাজে বেরিয়ে যান, মা লোকের বাড়ি রান্না করতে বা বাসন মাজতে। কিংবা হয়ত রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজে বা অন্য কিছু। ছেলেমেয়ের সাথে দেখাই হয় না সে সময়, তো টিফিন বানিয়ে দেওয়া হবে কি করে! আর এই হতভাগ্যদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। মিড-ডে মিল প্রকল্প এই সঙ্কটটা প্রায় কাটিয়ে দিতে পেরেছে। উপরন্তু স্কুলে প্রায় আসতই না, এরকম অনেককেই নিয়মিত খাবারটুকু পাওয়া যাবে, এই টান বিদ্যালয়মুখী করেছে। স্কুলে আর পড়াশুনো হবে না, রান্না, খাওয়া-দাওয়া—এসবই করেই দিন কেটে যাবে, এরকমটাই অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। মিড-ডে মিল চালু হলে পড়াশোনার ক্ষতি হয়ে যাবে কিনা, এরকম আশঙ্কা আমাদের অনেকেরই ছিল। অভিজ্ঞতা বলছে, লাভের দিকে পাল্লাটা খুব বেশিই হেলে আছে।

কিন্তু এমন সম্ভবনাময় একটি প্রকল্পের পরতে পরতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা বেশ পীড়াদায়ক। আশঙ্কার জায়গাগুলো কোথায়? প্রথমত, এত অল্প সংখ্যক কর্মী দিয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্প চালানো হয় যে তাদের পক্ষে সময় মেনে কাজ সামলে ওঠা মুশকিল। অভিজ্ঞতা বলে দারিদ্র অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো আর যাই হোক জনসংখ্যায় পিছিয়ে নেই। ফলে বিদ্যালয়গুলো প্রচুর ছাত্রসংখ্যার চাপ নিয়ে হাসফাঁস করে। ৫ জন কর্মীর পক্ষে বাজার ইত্যাদি সামলে রান্না শুরু করে বেলা ১টা-১.৩০টা মধ্যে ৬০০, ৭০০ বা তারও বেশি ছেলেমেয়ের ভাত, ডাল, তরকারি করে ফেলা বেশ দুরূহ কাজ। দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন এই দুরূহ কাজ দৈনিক ১০০ টাকার মত মজুরিতে করে যেতে হয় অসম্ভব দ্রুততায়। ফলে তৈরি হয় বিপদের আশঙ্কা। চূড়ান্ত তাড়াহুড়োর বাস্তব প্রয়োজন যেভাবে অসতর্ক হওয়ার পথ তৈরি করে দেয়, সেটা মারাত্মক। কাজের অনুপাতে কর্মী নিয়োগ না করার যে প্রবণতা ভারতীয় রেলের মত বড় ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে অনেক সময় দেখা দিচ্ছে, ছোট ছোট শিশুদের মিড-ডে মিল প্রকল্পেও তা সক্রিয় হয়ে উঠছে কিনা বিশেষ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রান্নাঘর, খাবার পরিবেশনের জায়গা, জলের উৎস প্রভৃতি মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মিড-ডে মিল প্রকল্পে ছাত্রছাত্রী পিছু রান্নাঘর, বাসনপত্র-এর বরাদ্দ ভালই (ব্যতিক্রম নিশ্চিত আছে), কিন্তু তার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ হয় না। প্রকল্পের অর্থ চুরি হয়ে যায়, এমনটা না হলেও বহু ক্ষেত্রে মিড-ডে মিল প্রকল্পের অর্থ খরচ করে ফেলা হয় স্কুলের নানা খাতে। বিদ্যালয় স্তরের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা বিদ্যালয় নিযুক্ত আংশিক শিক্ষকদের বেতন, যা সরকার দেয় না, সেটা হোক বা বাড়তি নানা খরচ যোগাড় করার জন্য মিড-ডে মিল প্রকল্প থেকে অর্থ সরবরাহ করা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বেশ চালু একটি রীতি। এসব কারণে মিড-ডে মিল প্রকল্পের পরিচ্ছন্নতার দিকটি নিশ্চিতভাবেই বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়। ওয়াকিবহাল মহলে এটা একটা 'ওপেন সিক্রেট', কিন্তু বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিব্যি রমরমিয়ে চলছে তথাকথিত এই 'প্র্যাগমাটিজম'।

কাগজে কলমে নিরাপত্তা বিধি বলবৎ থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার চূড়ান্ত অভাব। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, আপদকালীন সময়ে তার ব্যবহার জ্ঞান ইত্যাদি খুব অল্প জায়গাতেই উপলব্ধ। সবথেকে বড় কথা নানা দিক থেকে সুরক্ষার প্রশ্নে এত স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে তদারকি ব্যবস্থা নামমাত্র ও নেহাৎ আনুষ্ঠানিক। সরকার ও বিভিন্ন স্তরের প্রশাসন প্রকল্পটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ, চাল ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করলেও তদারকির ব্যাপারে উদাসীনতার জন্য ঘটা বিপদের দায় এড়াতে পারেন না। অভিভাবক সমিতি তৈরি করে ও সরকার প্রশাসনের তরফে নিয়ম করে মিড-ডে মিল প্রকল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ কতটা জরুরী তা বিহার বা মহারাষ্ট্রের মর্মান্তিক ঘটনাগুলো তুলে ধরছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে তা মারাত্মক সব বিপজ্জনক সম্ভাবনার হিমশৈলের চূড়া মাত্র। সঙ্কটের সামান্যই প্রকাশিত, বেশিরভাগ এখনও অগোচরেই আছে।

- সৌভিক ঘোষাল

স্থায়ী বঞ্চনার শিকার ...

তিনের পাতার পর

এ ছাড়াও খাদ্যের অধিকার, বি পি এল কার্ড, এম এন আর ই জি এ, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, সস্তায় রেশন, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ইউনিটের ব্যবস্থা, সম কাজে সম বেতন, মহিলা ও পুরুষদের মধ্যকার বেতন বৈষম্য দূর করা, ক্রেশ, জ্বালানি, চিকিৎসা, অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসবকালীন সময়ে সবেতন ছুটি প্রভৃতি দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার সুযোগ আছে। উত্তরবঙ্গে চা বাগান শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা বাড়ছে।

- নবেন্দু দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র ঃ নিউ ট্রেড ইউনিয়ন ইনিশিয়েটিভ (এন টি ইউ আই) ও পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি (পি বি কে এম এস)

রাস্তার গণতন্ত্রের অধিকার কেড়ে নিতে দেওয়া যাবে না

সাধারণ মানুষের 'স্বার্থ' রক্ষার নামে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র থেকে মিছিল-সমাবেশকে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ সক্রিয় আরও একবার। এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে এক প্রস্তাব জমা দিয়েছে। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী বিবাদী বাগ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কাজের দিনে কোন মিছিল-সমাবেশ করা যাবে না। পড়াশোনার অঞ্চল কলেজ স্ট্রীট এবং যাদবপুর অঞ্চলকেও ঐ প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, শুধু ছুটির দিনে পুরসভার ঠিক করে দেওয়া স্থানেই ঐ সমস্ত অঞ্চলে মিছিল-সমাবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ঐ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ''কলকাতা কর্পোরেশন, পূর্ত দপ্তর, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ও পুর-নগরোন্নয়ন দপ্তরকে দু-সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হচ্ছে এবং বিষয়টি নিয়ে তিন সপ্তাহ পর শুনানী হবে।''

সরকারের একেবারে ওপর তলার সবুজ সংকেত ছাড়া যে ঐ প্রস্তাব আদালতের কাছে জমা পড়তে পারে না তা সহজেই বোধগম্য। বিরোধী পক্ষে থাকার সময় সমাবেশের জন্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্রই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে পছন্দের জায়গা থাকলেও এখন তিনি এখানে মিছিল-মিটিং-এর বিপক্ষে। হাইকোর্টে জমা দেওয়া প্রস্তাবের সমর্থনে তৃণমূলের দু-নম্বর নেতা শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁরা ''আন্দোলনের জন্য মানুষের অসুবিধা তৈরির বিপক্ষে।'' দু-বছরের কিছু বেশি সময় আগে যে আন্দোলন ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র, সেই আন্দোলন সম্পর্কে এঁদের এখন কি প্রবল অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা! সি পি আই (এম) সহ বামফ্রন্টের শরিকরা, এস ইউ সি আই এমনকি কংগ্রেসও ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

লেখার শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এই উদ্যোগ নতুন নয়। এর আগে বামফ্রন্ট জমানাতেও এরকমই এক উদ্যোগ সক্রিয় হয়েছিল। বুদ্ধবাবু তখন অল্পদিনের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জমানাতে ২০০২-এর ২১ ফেব্রুয়ারী কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে প্রস্তাব করেন ঃ সোম থেকে শুক্রবার শহরে কোন সমাবেশ করা যাবে না; সরকারের ঠিক করে দেওয়া সময়েই সমাবেশ অনুষ্ঠিত করতে হবে; রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবে। দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার প্রয়াস অতএব দীর্ঘদিন ধরেই জারি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমিতাভ লালা ২০০৬-এর ২৯ সেপ্টেম্বর মিছিল-সমাবেশের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে যে রায় দেন তার সঙ্গে তৎকালীন সরকারের এই উদ্যোগের সাদৃশ্য খালি চোখেই ধরা পড়ে। তাঁর ঐ রায়ে বিচারপতি লালা বলেছিলেন, সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরে কোন মিছিল করা যাবে না; সমাবেশের অনুমতি নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে ভালো পরিমাণ টাকা জমা দিতে হবে, কেননা, ঐ মিছিলের ফলে কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ঐ টাকা থেকে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে; ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক ক্ষতিপূরণ না পেলে মিছিল সংগঠক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরার সেদিনের ঘটনার সঙ্গে আজকের উদ্যোগের কি ভয়ঙ্কর মিল। সি পি আই (এম) সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল (বিচারপতি লালার বিরুদ্ধে বিমান বসুর ছন্দ মেলানো পরামর্শ তো এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে!) ঐ রায়ের বিরোধিতা করলেও (পরবর্তীকালে ঐ রায়ের ওপর অবশ্য স্থগিতাদেশ জারি হয়), রায় বেরোনোর ঠিক একমাস পর বুদ্ধবাবু সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে মহাকরণে এক বৈঠক করেন। উদ্দেশ্য, মিছিল-সমাবেশকে নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে ঐকমত্যে পৌঁছানো (জানা যায়, সেদিন অর্থাৎ ২০০৩-এর ২৯ অক্টোবর সকাল বেলায় বুদ্ধবাবু বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে বৈঠকে শিল্পপতিদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, অকারণে যখন-তখন মিছিল-মিটিংকে তাঁর সরকার বরদাস্ত করবে না)। সেদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে সি পি আই (এম এল) দরিদ্র-নিপীড়িত জনগণের প্রতিবাদের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। সরকারের কাছে সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষে সেদিন যে বক্তব্য রাখা হয় তার অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে ঃ ''মিটিং-মিছিল-সমাবেশ গণআন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জনগণের এই গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার যে কোন প্রচেষ্টাকে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তি এবং ব্যক্তিবর্গ সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা রাজ্যের সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে আবেদন করছি গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার যে কোন সরকারি অপচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করুন।'' (আজকের দেশব্রতী, ৩০ অক্টোবর, ২০০৩)

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে ঃ সমাবেশকে, প্রতিবাদের অধিকারকে খর্ব করার এই উদ্যোগ বারবারই মাথাচাড়া দিচ্ছে কেন? একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় তো ছুটির দিনেও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে। ''সাধারণ নাগরিকের'' অসুবিধার কথা বলে মিছিল-সমাবেশকে নিষিদ্ধ করার কথা বলা হলেও এর পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। নয়া-উদারবাদী জমানা মানুষকে যতই নিঃস্ব করছে, তাদের অধিকারকে হরণ করছে, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের নখ-দাঁত যত ভয়ঙ্কর হয়ে দরিদ্র-নিপীড়তদের ওপর থাবা বসিয়েছে, রাস্তার গণতন্ত্র ততই প্রয়োজনীয় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নিজেদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেটাতে লক্ষ লক্ষ জনগণ রাস্তায় নেমেছেন, শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। সিয়াটল, জেনোয়া, প্রাগ, অকুপাই আন্দোলন, তাহরির স্কোয়ার, তুরস্কের তাকসিম স্কোয়ার তো আজ ইতিহাস। নন্দীগ্রাম গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল, দিল্লীতে অকুতোভয় মেয়েটির ধর্ষকদের শাস্তির ও ধর্ষণ-রাজকে নিশ্চিহ্ন করার দাবিতে দিল্লীর আন্দোলন, বা অতি সম্প্রতি কামদুনি ধর্ষণ-হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল—এসবই সংগঠিত হয়েছে কলকাতা ও দিল্লীর রাজপথে। যে সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত এই সমস্ত প্রতিবাদ, সেগুলোর ফয়সালা সংসদ, বিধানসভা, টিভি চ্যানেলের নিষ্প্রাণ বিতর্কে সম্ভব নয়। রাস্তার গণতন্ত্রই তার প্রকৃষ্ট পন্থা, রাজপথই তার প্রকৃত স্থান। রাস্তার গণতন্ত্র বিদ্যমান ব্যবস্থার কাছে এক চ্যালেঞ্জ। এই ব্যবস্থার প্রতি বিপন্নতার যে কোন সম্ভাবনাতেই যারা শিউরে ওঠে, কর্পোরেটপন্থী ও দরিদ্র বিরোধী সংস্কারের ধারার পথে যে কোন প্রতিবন্ধকতাকেই যারা যে কোন মূল্যেই নির্মূল করতে চায়—ব্যবস্থার সেবক সরকারগুলো, কর্পোরেট লবি, বড় ব্যবসায়ী লবি, সমাজের ওপরতলার অংশই যে গণতন্ত্রের অধিকার খর্বের পিছনে মূল উদ্যোক্তা তা বুঝে নিতে গণতান্ত্রিক মানুষের একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, যে পুলিশ কলকাতার রাজপথে মিছিল, মিটিং নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেছে তাদেরই কিছু সদস্য নিজেদের সমস্যার সমাধানে কলকাতার রাজপথে না হলেও অন্যত্র রাস্তার আন্দোলনকেই বেছে নিয়েছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এরকম দুটি সংবাদ বেরিয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ভাতার থানার সামনে। সেখান থেকে কিছু পুলিশ কর্মীর উত্তর ২৪ পরগণায় নির্বাচনের ডিউটিতে যাওয়ার কথা ছিল। যথেষ্ট সংখ্যক বাস না থাকায় তাঁদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। শেষে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে, তাঁরা পথ অবরোধ করেন এবং এমনকি ইট-পাথর ছুঁড়েও তাদের প্রতিবাদ জানান। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে আলিপুর পুলিশ লাইনের সামনে। কিছু পুলিশ কর্মী নির্বাচনের ডিউটিতে যাবেন না বলে রাস্তায় ধর্ণায় বসে যান। পুলিশের কাছেও রাস্তার আন্দোলন অতএব অচ্ছুৎ নয়।

বিষয়টি যেহেতু আদালতের বিবেচনাধীন, তাই আদালতের রায়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আদালতের অতি সক্রিয়তার পিছনে যে বিদ্যমান নির্মম ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা কাজ করে সেটি বিস্মৃত হলে চলবে না। প্রশাসন নিজে যেটা করতে পারে না, যেটা করতে গেলে সরকারের রাজনৈতিক ঝুঁকি থাকে, আদালতকে দিয়ে সেটি করিয়ে নেওয়ার চলও আদালতের সক্রিয়তার পিছনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আদালতই ধর্মঘট করার শ্রমিক-কর্মচারীর অধিকারকে খর্ব করতে উদ্যত হয়েছে, দিল্লী-মুম্বাইয়ের মত শহরে বস্তি গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, শহরে থাকতে পারার ক্ষমতা না থাকলে শহর ছেড়ে দরিদ্রদের চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আদালতের এই সক্রিয়তা ও জনস্বার্থের মামলাগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, ''দরিদ্রদের অধিকারগুলো রক্ষা করার পরিবর্তে সেগুলোকে (জনস্বার্থ মামলাগুলো) এখন কাজে লাগাচ্ছে বাণিজ্যিক স্বার্থের ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূরা, দরিদ্রদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ নামাতেই তা করা হচ্ছে, দরিদ্রদের অধিকারে থাকা শহরাঞ্চলের জায়গাগুলো এবং এমনকি গ্রামাঞ্চলের জমিও নিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেখানে ঘটানো হবে বাণিজ্যিক উন্নয়ন''। কলকাতা পুলিশের জমা দেওয়া প্রস্তাব যেহেতু একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই, তাই এই মামলার পরিণতি কোনদিকে গড়ায় তার ওপর আমাদের তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। আর এটাও বুঝতে হবে যে, আদালতের কাছে পুলিশের প্রস্তাব গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রের গ্রেপ্তারি থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো দখলে পেশী শক্তির প্রয়োগ, অধ্যক্ষ-অধ্যাপক-শিক্ষকদের ওপর হামলা, বিরোধী পক্ষের দলের পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনের অফিস বলপূর্বক দখল করে নেওয়া, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হকার ও দরিদ্র মানুষদের উচ্ছেদ, 'সার্ভিস রুল' সংশোধন করে সরকারি কর্মচারিদের অর্জিত অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ, ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের ওপর হামলা, পঞ্চায়েত নির্বাচনে চালানো সর্বব্যাপী সন্ত্রাস এবং মুখ্যমন্ত্রীর মুহুর্মুহু স্বৈরাচারী হুমকি—গণতন্ত্রের ওপর সার্বিক আক্রমণের এক পটভূমিতেই এসেছে এই প্রস্তাব। জনস্বার্থের মামলাকে উপলক্ষ করে আদালত যদি প্রতিবাদের অধিকারকে, রাজপথে শ্লোগানোর অধিকারকে, প্রতিবাদী মানুষের পদভারে রাজপথকে কাঁপিয়ে দেওয়ার অধিকারকে খর্ব করতে উদ্যত হয় তবে রাস্তায় নেমেই রাস্তার গণতন্ত্রের অধিকারের সুরক্ষায় সক্রিয় হতে হবে। রাজপথের আন্দোলনই সৃষ্টি করে ইতিহাস, নিয়ে আসে কাঙ্খিত পরিবর্তন। কোন মূল্যেই এই অধিকার কাউকেই কেড়ে নিতে দেওয়া যাবে না।

- জয়দীপ মিত্র

সুস্মিত বোস ঃ সত্তরের স্বপ্ন—সমকালের ডাক

সময় ও শিল্পের দূরত্ব ঠিক কতটা হলে বিস্মৃতি বলে? বা 'আপন হতে বাহির'—না হওয়ার প্র্যাকটিস? —জানি না। লোকটা ইশরাত জাহান বা থাংজাম মনোরমাকে একযোগে বলেন—'অল রাইজ'। শর্মিলার না খাওয়ার জেদ-এর মুখে গেয়ে ওঠেন—হু ইজ টু বি ব্লেমড। সমকালে 'বিনায়ক' নামক এক 'পাবলিক', থুড়ি আমআদমি—অহেতুক বন্দী হলে যিনি চিৎকার করে গান ধরেন—ডক্টর বিনায়ক সেন/দ্য ম্যান অব দ্য পিপল, ইউ টিউব হয়ে যে গান অজস্র মিছিলে উচ্চারিত হতে হতে—পাড়ি দেয় বিশ্বে। আজকাল তিনি তেষট্টিতে। ধোপদুরস্ত সাদা দাড়ি। তবে গিটার ধরাটা আজও—অস্ত্রের মতো।

সুস্মিত বোস। সার্চ মেশিন জানান দিচ্ছে—আলিগড়, দিল্লী, পুনে বা গুয়াহাটি, শিলচর, শিলংয়ের রাজনীতি সচেতন, বলা ভাল যারা 'ষাট-সত্তর' দশকের মুখোমুখি হতে চান—তারা ডাক পাঠালেই পৌঁছে যান ইণ্ডিয়ান ডিলান।

'৭৩-এ প্রথম অ্যালবাম 'উইনার বেবি' ভারতীয় বাজারে নিল ডায়মণ্ডের সঙ্গে টক্কর দিয়ে উঠে আসে এইচ এম ভি-র সেরা দশের তালিকায়। '৭৮-এ অ্যালবাম 'ট্রেন টু ক্যালকাটা'। গত দেড় দশকে নিজের গানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন সমকালীন প্রতিবাদ, দাবি, প্রতিরোধ; সেই কবে থেকে সমকাল টুকে রেখে অনন্ত সুখময় জীবনের কথা বলে সুস্মিতের গান।

গত দু-দশকে ৭টি বেসিক অ্যালবাম। স্কুল জীবনে পাওয়া গিটার সঙ্গী করে চার দশকের বেশী অচেনা পথে চলেছেন এই প্রবাসী বাঙালী। '৮৩-তে পীট সিগারের সঙ্গে দেখা। বছর দশেক পরে হঠাৎ সব অ্যালবাম চেয়ে ৬০ ডলারের চেক পাঠালেন পীট স্বয়ং। সুস্মিত চেক ভাঙাননি। শুধু পীটের মতো বাঁচতে চেয়েছেন মনে মনে। শুরুতে কমিউনিস্ট বলে গানের মঞ্চে ব্রাত্য। তারপর পরিচয় সোশ্যালিস্ট। আজকাল কেউ কেউ বলেন সোশ্যাল কমিউনিস্ট। সুস্মিত নিজে বলে—হিপি। ফোক দি আরবান সিঙ্গার। রক্তপাত, যুদ্ধহীন পৃথিবী তাঁর স্বপ্ন।

হঠাৎই ফেসবুকে খোঁজের পর দেবরাজ, অম্লান, রঞ্জিত, সৃজন, দেবর্ষিরা—পেলেন সুস্মিত বোসের সন্ধান। গত ১৭ জুলাই বালীগঞ্জের উইভার্স স্টুডিও। অনেকের সঙ্গে হাজির স্বয়ং বিনায়ক সেন আর যাদবপুর ফিল্ম স্টাডির অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সুস্মিতের গল্পের ফাঁকে গান ধরলেন স্বয়ং বিনায়ক—'উই আর ইন দ্যা সেম বোট ব্রাদার'। বা 'ব্লোয়িং ইন দ্যা উইণ্ড'। সঞ্জয়দা শোনালেন—ষাট-সত্তরের মিছিলের আগে কিভাবে আকাশের দিকে হাত তুলে তরুণ কলকাতা। ভিয়েতনাম শ্লোগান হলে কিভাবে ধরা দিতেন পীট সিগার বেলাফন্টে-সাইমন অ্যাণ্ডগাফাঙ্কলরা। ৪০ বছরে অচেনা সুস্মিতকে দেখে সত্তরের খোঁজ শুরু হয়। সঞ্জয়বাবুর মতে এত দিন—স্তুতির নাম ছিল 'সত্তর দশক'।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮ জুলাই সংখ্যার ৪ পাতায় ''সিঙ্গুরের অসমাপ্ত লড়াই ...'' লেখাটির প্রথম কলমের ১৫ লাইনে ৫৫৭ একরের পরিবর্তে ৫৯৭ একর পড়তে হবে।

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

উদীয়মান জাপান-ভারত সম্পর্ক
ইতিহাস বিরুদ্ধ পরমাণু নীতি, সমরবাদ ও অন্ধ উন্নয়ন সর্বস্বতা

(২০১৩-র ২ জুন এশিয়া-প্যাসিফিক জার্নালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি লিবারেশন জুলাই '১৩ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উদীয়মান ভারত-জাপান সম্পর্ক চরম প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি—একদিকে ভারত এবং জাপানে উদ্দীপনা ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে চীনের আশঙ্কার কারণ হয়েছে। এই নতুন ''রণনৈতিক অংশীদারিত্ব'' এবং বিশেষত পারমাণবিক সহযোগিতা নিয়ে যে আলোচনা চলছে তা প্রতীয়মান হচ্ছে এশিয়ার পক্ষে শুভ নয়। পি কে সুন্দরম, যিনি ভারত এবং জাপানের জনগণের মধ্যে শক্তিশালী সুসম্পর্ক গড়ে তোলার এক জোরালো প্রবক্তা, তিনি জবাব দিচ্ছেন।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবে, একটি দেশ যে পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে তার অস্ত্র ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে এবং অস্ত্র প্রক্ষেপ ব্যবস্থাকে উন্নত করে চলেছে তাকে পুরস্কৃত করার জাপানী সিদ্ধান্ত পরমাণু অ-সম্প্রসারণ রাজের ওপর এক মারাত্মক আঘাত এবং তা বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচীর ভবিষ্যত আরও দুর্বল করবে। যখন উন্নত অসামরিক পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জন করা থেকে ইরানকে প্রতিহত করার জন্য তীব্র আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে এই বলে যে তা অ-সম্প্রসারণ রাজের পক্ষে মারাত্মক বিপদ, সেখানে ইন্দো-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তিকে প্রসারিত করা হচ্ছে যাতে ভারতের জন্য ২০০৮-এর পারমাণবিক সরবরাহকারী গ্রুপের আইনের আওতায় কিছু নির্বাচিত ছাড় দেওয়া যায়। (ঐ আইনে এন পি টি-তে স্বাক্ষর করেনি এমন দেশগুলোকে পরমাণু প্রযুক্তি সরবরাহ নিষিদ্ধ হয়)। প্রকৃতপক্ষে, এন এস জি-র উদ্ভব হয় ১৯৭৪ সালে ভারত পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায়। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল কানাডা, আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ থেকে সরঞ্জাম ও কলাকৌশল সংগ্রহ করে এবং পারমাণবিক শক্তির 'শান্তিপূর্ণ' ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে।

যখন ১৯৯৮ সালে ভাতের দ্বিতীয় পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর আমেরিকা ভারতের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে তা ভারতের তুলনায় আমেরিকারই বেশি ক্ষতি করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তার মনোভাব বদল করতে থাকে এবং ভারতকে এক দায়িত্বশীল পারমাণবিক শক্তি হিসাবে বলতে শুরু করে। আমেরিকা, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও রাষ্ট্রসচিব জর্জ ডব্লিউ ব্রুসের মধ্যে এক আণবিক চুক্তির মাধ্যমে ভারতের নিউক্লিয়ার স্ট্যাটাসকে মূল ধারায় নিয়ে আসে; ভারত উপলব্ধি করে আমেরিকার সন্ত্রাস বিরোধী দুনিয়াজোড়া যুদ্ধের সহযোগি হিসাবে ভারতকে তার সঙ্গে নিয়ে আসার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি। ব্যবহারিক দিক থেকে ভারত পারমাণবিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কয়েক দশকের পুরনো আন্তর্জাতিক সহমতকে তার উদীয়মান বাজার ও মধ্যবিত্ত উপভোক্তাভিত্তি, পশ্চিমীদের প্রতি রণনৈতিক সমর্থনের গুরুত্ব এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সকে এন এস জি-র বৈঠকে খোলাখুলি ১০,০০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক চুল্লী প্রকল্পের অফার দেওয়া, এসব আকর্ষণ দিয়ে জয় করে নিতে পেরেছে।

জাপান সরকার সে সময় ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তি নিয়ে নিন্দা ব্যক্ত করেছিল কিন্তু পরে মার্কিন চাপের কাছে নতিস্বীকার করে এবং এন এস জি-তে ভারতের ছাড়কে সমর্থন করে। জাপানের নাগরিক সমাজ বিশেষ করে শান্তি সংগঠনগুলো এবং হিরোসিমা ও নাগাসাকির ক্ষতিগ্রস্তদের সংগঠনগুলো কঠোরভাবে দ্বিমত পোষণ করে। হিবাকুশা গ্রুপগুলো জাপান সরকারের (আমেরিকার) চাপের মুখে ভেঙে পড়ার নিন্দা জানায়; ''আণবিক বোমার ইতিহাস সত্ত্বেও জাপান সরকার মার্কিন-ভারত পরমাণু চুক্তিকে মেনে নিয়েছে যাতে ভারতকে ব্যতিক্রমী সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, এমনকি এন পি টি ব্যবস্থার ওপর আসা আঘাতকে ন্যূনতম করার কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই। আর করতে গিয়ে সে (জাপান সরকার) হিরোশিমা ও নাগাসাকির প্রতিনিধিত্বকারী হিবাকুশা গ্রুপ (পারমাণবিক ভুক্তভোগী)-গুলোর, এই দুই নগরের মেয়রদের, তাদের গভর্ণরদের স্থানীয় পরিষদগুলো ও প্রিফেক্চারাল অ্যাসেম্বলির বিবৃতিকে এবং হিবাকুশা গ্রুপগুলোর, জাপানের পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ গ্রুপগুলোর যারা নিরস্ত্রীকরণের জন্য বহু বছর ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে তাদের সম্মিলিত আহ্বানকেও অগ্রাহ্য করেছে। জাপান সরকার জাপান প্রয়েট সদস্যদের (জাপান সংসদ) পার্টি নির্বিশেষে বিরোধিতাকেও অগ্রাহ্য করেছে। যে দেশের ওপর পারমাণবিক আক্রমণ হয়েছিল সেই দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের এইরকম একটা সরকার রয়েছে?''

যাই হোক, জাপান সরকার ভারতের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা ও ফ্রান্সের চাপ ছাড়াও তার নিজের দেশের পারমাণবিক কোম্পানীগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থের বিষয়টাও আর একটি জরুরী বিষয়, বিশেষ করে ফুকুশিমা দুর্ঘটনা এবং অধিকাংশ জাপানী পরমাণু চুল্লীগুলো নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকার দরুণ যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তির জবাবে যেমন তেমনি ইন্দো-জাপান পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধেও জাপানের হিবাকুশা গ্রুপগুলো প্রতিবাদ জানিয়েছে। ২০১০-এর নাগাসাকি শান্তি ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, জাপান-ভারত পারমাণবিক চুক্তি এশিয়ায় সামরিক প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে তুলবে এবং আণবিক যুদ্ধের বিপদকে বৃদ্ধি করবে।

ভারত আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করেছে এবং ফ্রান্স, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করেছে সিটিবিটি-তে স্বাক্ষর না করেই। কিন্তু জাপানের সঙ্গে সেরকমটা করতে অনাগ্রহী। খবরে প্রকাশ, ভারত এমনকি দ্বিপাক্ষিক পারমাণবিক চুক্তিতে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ' এই শব্দবন্ধকেই রাখতে নারাজ যা আন্তর্জাতিকভাবে আবশ্যিক সিটিবিটি-র পরিপন্থী।

ভারত যা প্রস্তাব দিয়েছে তা হল পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ রাখার এক স্বেচ্ছা ঘোষণা (এবং জাপানী কোম্পানীগুলোর জন্য লোভনীয় চুক্তির অফার)। সাম্প্রতিক যৌথ ঘোষণায় যেখানে আবে শিন জো সিটিবিটি-র গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন সেখানে মনমোহন সিং স্বেচ্ছায় পরীক্ষা বন্ধ রাখার ওপর তার জেদ ধরে থেকেছেন। মূলধারার জাপানী সংবাদপত্রগুলো জাপানের অর্থনীতির অগ্রগতির উন্নতি ও পারমাণবিক অস্ত্র অ-সম্প্রসারণের মধ্যে একটি গ্রহণ করার দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করেছে এবং এই মতামত ব্যক্ত করেছে যে উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে রক্ষণশীল ইওমুরি শিমবুন একবাক্যে আণবিক চুক্তিকে সমর্থন করেছে এবং তাকে ''দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির চাবিকাঠি'' বলে বর্ণনা করেছেন। সংবাদ মাধ্যমে সিং-এর সফরকালে পারমাণবিক চুক্তি সম্পন্ন হতে না পারার কারণ হিসাবে সিটিবিটি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামতকে উল্লেখ করা হয়েছে। জাপান সফরের আগে ইতিবাচক শোরগোল সত্ত্বেও ২৭ মে টোকিওয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ''নিউক্লিয়ার'' শব্দটির অনুপস্থিতি এই সঙ্কেত দিচ্ছে যে তিনি এল ডি পি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা বুঝতে পেরেছেন।

তবে, একটা ব্যাপক মতামত রয়েছে যে জাপান সরকার সিটিবিটি মেনে নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করা ছেড়ে দেবে এবং আগামী জুলাই মাসের নির্বাচনে এল ডি পি শক্তিশালী জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় এলেই ভারতের সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলবে। ১৯৯৮ সালের ভারতের পারমানবিক পরীক্ষার এই পঞ্চদশতম বছরে জাপান কর্তৃক আণবিক অস্ত্রের মান্যতা দান অন্যান্য দেশের পক্ষে একটা খারাপ নজির হয়ে থাকবে এবং তার দক্ষিণ এশিয়ায় আণবিক ও প্রচলিত অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে দেবে।

আণবিক অস্ত্র দক্ষিণ এশিয়ায় রণনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে এই প্রারম্ভিক দাবির বিপরীতে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ১৯৯৮ সালের ৩৫,২৭৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে বিশাল ২,০৩,৬৭১.১ কোটি টাকা হয়েছে যা আঞ্চলিক অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্চ মাসে প্রকাশিত এস আই পি আর আই-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বছর ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ অস্ত্র আমদানিকারক দেশ। আণবিক অস্ত্রের আধুনিকীকরণ এবং প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার বহুমুখীকরণও এই অঞ্চলে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জাপান-ভারত পারমাণবিক চুক্তি এই প্রতিযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করে সামরিকিকরণের দিকে নিয়ে যাবে এবং এশিয়ায় পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদকে বাড়িয়ে দেবে।

(৩) ভারতের পরমাণু শক্তির প্রসারে ইন্ধন সরবরাহ

আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং এখন জাপানের কাছ থেকে চুল্লী কেনার বিনিময়ে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রকে মান্যতা প্রদানের জন্য দরকষাকষি ভারতের সাধারণ জনগণের জন্য ভয়াবহতায় পর্যবসিত হয়েছে। যেখানে ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তিকে বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গণতন্ত্রের এক মহামিলন রূপে ফেরী করা হয়েছিল, তখন ভারত সরকার গ্রামস্তরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংস্থাগুলোর বক্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে তৃণমূলস্তরে গড়ে ওঠা বড় আকারের পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের ওপর দমনপীড়ন নামিয়ে এনেছে। আগামী ২০-৩০ বছরে ভারতের কম করে ২০টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভারত ঘোষণা করেছে মোট বিদ্যুৎ শক্তির ২৫ শতাংশ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করার উচ্চাভিলাষি পরিকল্পনা—যা বর্তমান পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ১০০ গুণ বৃদ্ধি। এই (পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের) প্রসার দেশের বেশকিছু অংশের জনগণকে বাস্তুচ্যুত ও জীবিকার সংস্থাহীন হয়ে যাওয়ার, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাহীনতা, কৃষিজমি জোর করে কেড়ে নেওয়া এবং দুর্বল পরিবেশ ব্যবস্থা বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে ভীত করে তুলেছে।

প্রধানত তিনটি বিষয়ে দুশ্চিন্তা থেকে ভারতে পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে ঃ দরিদ্র ভারতবাসীর জীবিকার প্রশ্ন, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অন্তর্নিহিত বিপদ, চেরনোবিল ও ফুকুশিমার দুর্ঘটনা এবং ভারতের পারমাণবিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও দক্ষতার পুরোপুরি অভাব।

দেশের সমস্ত অংশের জনগণের আন্দোলন প্রতিবাদে পরিণত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ অংশে কুড়ানকুলাম, পূর্বে কোভভাডা, পশ্চিম উপকুল অঞ্চলে মিঠিভিরদি, দেশের মধ্যস্থলে চুটকা, রাজধানীর কাছাকাছি গোরখপুরে এবং সুদুর উত্তর-পূর্বে ডমিয়াসিয়াট (ইউরেনিয়াম খনিজ আকরিকের জন্য পারমাণবিক প্রতিষ্ঠানের নজরে রয়েছে)। এই সমস্ত স্থানে প্রতিবাদ খুবই তীব্র, তবে উল্লেখযোগ্যভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। বিরাট সংখ্যায় মহিলা ও শিশুরা সহ তৃণমূল স্তরের জনগণ কয়েক বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে, অহিংসভাবে প্রতিরোধে সামিল হয়েছিল।

কয়েকদিন ধরে গণঅনশন ধর্মঘট, শান্তিপূর্ণভাবে নির্মাণস্থল ঘেরাও, নৌকা নিয়ে মৎস্যজীবিদের সামুদ্রিক প্রতিবাদ এবং হাজার হাজার মানুষ সমুদ্রের জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবাদ—কুড়ানকুলামে সংঘটিত এই সব ধরণের আন্দোলনের স্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

এর স্পষ্ট বিপরীতে ভারত সরকার জনগণের ওপর বারংবার নিষ্ঠুর দমনপীড়ন নামিয়ে এনেছে। জনগণের প্রতিবাদ আন্দোলনের জবাবে কুড়ানকুলামে পুলিশ গ্রামগুলোকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখে কয়েক দিন ধরে, খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্র সহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। প্রতিবাদরত জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য মাথার ওপর দিয়ে বিমান চক্কর মারতে থাকে। জৈতাপুরে ও কুড়ানকুলামে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি ও গুলি চালিয়ে মৎস্যজীবীদের হত্যা করেছে, তাদের বাড়িঘর এবং মাছ ধরার নৌকাগুলো ভাঙচুর করেছে।

প্রতিবাদী জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এই সকল দৃষ্টান্ত টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গিয়েছে। আরও এগিয়ে গিয়ে, ভারত সরকার কুড়ানকুলামের হাজার হাজার গ্রামবাসীর ওপর ঔপনিবেশিক আমলের ''দেশদ্রোহিতা'' এবং ''ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা''—এইসব অভিযোগ দায়ের করেছে। এই অঞ্চলের অনেক যুবকেরা যারা আরব দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন, তাদের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এই সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনকে ''বিদেশী মদতপুষ্ট'' বলে তাকে দানবীয় কার্যকলাপ প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। তিনজন জাপানী সহ আন্তর্জাতিক সক্রিয় কর্মী এবং সাংবাদিকরা কুড়ানকুলামে প্রবেশের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষাগুলো যেখানে দেখাচ্ছে যে সারা বিশ্বজুড়ে জনগণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছে সেখানে ভারত সরকার প্রতিবাদী জনগণের বিচারবোধকে সম্পূর্ণভাবে অপমান করে তাদের ''পরামর্শদান''-এর জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে। এছাড়াও সরকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত মূল ডকুমেন্টগুলো এবং কুড়ানকুলাম ও অন্যান্য পরমাণু চুল্লীগুলোর স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত ডকুমেন্টগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি কুড়ানকুলাম পরমাণু চুল্লী চালু করার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে নিয়ন্ত্রণকারীদের নিজেদেরই বানানো নিয়মকানুনের খোলাখুলি অমান্য করা সত্ত্বেও। আদালতের রায় দেওয়া হয়েছে মূলত তিনটি বহুল বিতর্কিত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ঃ বিচারকদের বিশ্বাস ভারতের উন্নতির জন্য পরমাণু বিদ্যুৎ শক্তি খুবই দরকার, তারা বিশ্বাস করেন যে, দেশের পরমাণু সংস্থা দায়িত্বের সঙ্গে তাদের ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং বিচারকদের মতে অল্প সংখ্যক মানুষের আকাঙ্খার তুলনায় বৃহত্তর জনস্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং দেশের উন্নতির স্বার্থে তাদের এটা মেনে নেওয়া উচিত। বিচারকরা কেবল এই সমস্ত বিতর্কিত প্রস্তাবগুলোকে বিচারবিভাগীয় মান্যতাই দেননি, তারা আবেদনকারীদের উত্থাপিত কুড়ানকুলাম নির্দিষ্ট নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মগুলো লঙ্ঘন করার বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। এটি সম্ভবত বিশ্বের কেবলমাত্র পরমাণু চুল্লী যা কার্যকর করা হচ্ছে কোন স্বাধীনভাবে তার পরিবেশগত প্রভাবের পর্যালোচনা ছাড়াই, কোন প্রাকৃতিক পরিষ্কার জলের উৎস ছাড়াই, চুল্লীর ৭০০ মিটারের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের বসতি রয়েছে এমন অবস্থায় এবং প্রধান চুল্লীগৃহে ব্যবহৃত জ্বালানি জমা করার বিপদ সম্পর্কে ফুকুশিমা দুর্ঘটনা পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ না করেই।

এই ধরনের নিয়মাবলী না পালন করার অভিযোগে অন্যান্য জায়গায় প্রস্তাবিত পরমাণু চুল্লী প্রকল্পগুলোকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। জৈতাপুরে যে ফরাসি ই পি আর-প্যাটার্নের চুল্লী বসানো হচ্ছে তা পরীক্ষিত হয়নি এবং ঐ নতুন চুল্লী সর্বপ্রথম বসানো হচ্ছে যে ফিনল্যাণ্ডে সেখানে খরচ ১০০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। ভারতে তার দাম তিনগুণ বেড়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফিনিশ নিয়ন্ত্রক সংস্থা অ্যারেভা (ফরাসি কোম্পানি)-কে আদালতে নিয়ে গিয়েছে

সাতের পাতায় দেখুন

গণতন্ত্রের নামে এ রক্তস্নান বন্ধ কর

কল্পনা করুন ম্যাকবেথের সেই দৃশ্যটার কথা। আধো-অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে অসংখ্য বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি, মুখোশ-আঁটা ডাকিনী, যোগিনীর ফিসফিস করে কোন আগাম বীভৎসতা নিয়ে পরস্পরে কথা বলা, চলছে ডানকানকে হত্যার ষড়যন্ত্র। লেডি ম্যাকবেথ তার সম্রাজ্ঞী হওয়ার উচ্চাশা পূরণে সুরাপানে আচ্ছন্ন সম্রাট ডানকান ও তার সঙ্গীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। আজকের লেডি ম্যাকবেথ, সম্রাট ডানকান নয়, গণতন্ত্র হত্যার বীভৎসতা চালাচ্ছেন। এই বাংলায়, দীর্ঘমেয়াদী, একচ্ছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তথাকথিত 'পরিবর্তনের' নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। লাশকাটা ঘরে থরে থরে পড়ে আছে গ্রাম বাংলার অসহায় পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তরতাজা যে যুবকরা ভোটের লাইনে গণতন্ত্রের শরিক হয়েছিল, তাদের নিথর দেহগুলো এখন লাশকাটা ঘরে স্তূপীকৃত। রক্তস্নাত বাংলায় গণতন্ত্রের নামে, নির্বাচনের নামে চলছে হত্যার অভিযান। গ্রামের আলপথ, কৃষকের ফসলের গোলা, ক্ষেতমজুর, জনমজুরের এক চিলতে উঠোনে চাপ চাপ রক্ত জমাট বা আগুনের লেলিহান শিখা। এ যুগের লেডি ম্যাকবেথ, সেই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, যে ইতিহাস আজও জীবন্ত। একটা দশক জুড়ে বর্বরতার সেই অভিযানে হত্যা করা হয়েছিল একটা প্রজন্মকে। কাশীপুর, বরানগর, আড়িয়াদহ, বেলেঘাটা, কোন্নগর, মেদিনীপুর, ডেবরা, ফাঁসিদেওয়া, রায়গঞ্জ ... অজস্র নাম, অজস্র স্মৃতি। স্বৈরাচারের কলঙ্ক-ফলক। আজ সেই অতীত যেন ফিরে ফিরে আসছে।

সেদিনও, আজও সমস্ত বুর্জোয়া সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নীরব দর্শক। শাসকের ঔদ্ধত্যের মুখে নতজানু। এ রাজ্যে সংবিধান রক্ষার অভিভাবক রাজভবনের লাটসাহেব, আইনের রক্ষাকর্তা 'মহামান্য' বিচারপতিদ্বয় (যাঁদের ভূমিকা সন্দেহজনক), প্রশাসনের আমলাকুল, তথাকথিত 'কেন্দ্রীয় বাহিনী' এবং অবশ্যই রাজ্য নির্বাচন কমিশন—সকলেই গণতন্ত্রের এই ফলিত প্রয়োগে 'আনন্দিত ও সন্তুষ্ট'। এ বধ্যভূমিতে চলছে উন্মাদের উল্লাস-নৃত্য। যে বুর্জোয়ারা ও তাদের প্রতিনিধি শাসক দলগুলো অহর্নিশ অহিংসার স্তবগান করে, তারাই আজ রক্তস্নানে উল্লসিত। এক একটা মুহূর্ত যায়, আর সংবাদ আসে ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার নতুবা আলক্ষেতে উদ্ধার হওয়া কিশোরীর ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধারের। টিভি ক্যামেরার ঝলকানিতে বা সংবাদপত্রের পাতাজুড়ে প্রতিদিন সেই সংবাদের জীবন্ত গ্রাফিক চিত্রে রাজ্যবাসী আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। প্রান্তসীমায় থাকা মানুষজন রাজনীতির আরও প্রান্তসীমায় চলে যায়। এটাই শাসকের লক্ষ্য। রাজনীতিতে 'ঘেন্না' ধরানোর এর থেকে ভাল উপায় আর কি আছে!! স্বয়ং মার্কসও কল্পনা করে যেতে পারেননি, বুর্জোয়া শাসন এত কুৎসিত এত বীভৎস। বাংলার 'সুশীল' সমাজের অগ্রণীরা, যারা ভেবেছিলেন 'পরিবর্তন' এলে সুবাতাস বইবে, তাঁরা এখন ডিনার-টেবিলে ৩৪ বছর বনাম ২ বছর ৩ মাস—এই চুলছেঁড়া বিতর্কে উত্তপ্ত ও উদ্দীপ্ত। আমজনতার একটাই জিজ্ঞাসা ঃ 'লেডি ম্যাকবেথ', এ শ্মশানভূমিতে তুমি কোন ফুল ফোটাতে চাও?

ক্ষমতার রাজনীতি

রাজনীতির রুক্ষ জমিতে ফিরে আসা যাক। তথাকথিত মা-মাটি-মানুষের সরকারের স্থায়ীত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য শুধু মহানগরীর মহাকরণ থেকে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। 'শহরের সরকারের' সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রামের সরকারের' (গ্রামীণ মানুষেরা পঞ্চায়েতকে গ্রামের সরকার মনে করে) ওপরও নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। গ্রামের সমস্ত সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো----ক্লাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমবায়, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সর্বোপরি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিরঙ্কুশ থাবা বসাতে না পারলে 'মা-মাটি-মানুষ' কোন ঝোড়ো রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ধ্বসে যেতে পারে। তাই পঞ্চায়েতগুলো দখলে এত মরীয়া হামলা। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, সমস্ত আইন-কানুন, সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে নির্বাচনী বুথগুলোতে চলল অবাধ ভোট লুঠ, ছাপ্পা ও প্রক্সি ভোট, হিংসা ও রক্তপাত। একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার স্বার্থে মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর লুম্পেন বাহিনীর কাছে বিকল্প কোন পথ নেই। ২ বছর ২/৩ মাস ধরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, বাগাড়ম্বর আর ঝুড়ি ঝুড়ি অসত্য প্রলাপ ছাড়া এই সরকার এমন কোন কাজ করেনি, যা দিয়ে 'ইতিবাচক' ভোট আদায় করা সম্ভব। নারীর ওপর বলাৎকার, কৃষকের আত্মহত্যা, সারদা গোষ্ঠীর অবাধ অর্থ লুঠ, কলেজে কলেজে সন্ত্রাস, সিণ্ডিকেট-রাজ ইত্যাদি ঘটনাগুলো ইতিমধ্যেই এই সরকারের অভিমুখ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ইতিবাচক ভোট আশা করাই বাতুলতা, সন্ত্রাস ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

দ্বিতীয় কারণটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে ক্ষমতাতুর, ক্ষুধার্ত-গোষ্ঠী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ও সক্রিয় সামাজিক ভিত্তি, তাদের সকলকে তো আর মন্ত্রী-আধা/সিকি মন্ত্রী বা পরিষদীয় সচিব করে দেওয়া যায় না, অথচ তাদের ক্ষমতার ভাগ না দিলে তারাই বা তৃণমূল কংগ্রেস করবে কেন? সবুজ/লাল যে তৃণমূলীই হোক না কেন, তারা এ দলে ভিড় করেছে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার জন্য। ত্রি-স্তরে প্রায় ৫৮-৫৯ হাজার 'শূন্যপদ' পূরণে তৃণমূলী কর্মীদের নিয়োগ করার এত বড় সুযোগ কোন সরকারই বা হাতছাড়া করতে চায়। যারা 'নির্বাচিত' হতে পারবে না, তাদের জন্য খোলা হয়েছে পঞ্চায়েতে ঠিকেদারির ব্যবসা, রাস্তা বানানো, রাস্তা সারানো, পুকুর কাটা, পুকুর বোজানো, গাছ লাগানো, গাছ কাটা, বিভিন্ন পঞ্চায়েতী প্রকল্পে তদারকি (সুপার ভাইজার) করার মুক্ত আকাশ। এতেও ভাল সংখ্যক 'কর্মী নিয়োগের' সুযোগ থাকছে। এ কাজে যারা 'অগ্রণী সংগঠকের' ভূমিকা পালন করবে, তাদের জন্য খোলা থাকছে আগামী পৌরসভা নির্বাচন, পৌরপিতা-পৌরমাতা হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। যদুবংশ এভাবেই তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

যারা শুধু অর্থ/টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, ক্ষমতার উত্তাপ ভোগ করতে চায়, তাদের জন্য থাকছে বন্ধ কারখানার জমি, সিণ্ডিকেট ব্যবসা, সর্বোপরি থানার বড়, মেজো, সেজো 'বাবুদের' সঙ্গে ছিদ্রহীন বন্ধুত্বের সুযোগ। মেয়ে পাচার থেকে গরু পাচারে পুলিশের অকুণ্ঠ সহযোগিতা! দিদি-র ডাকে ভাই-বোনদের অভূতপূর্ব সাড়া দেওয়ার পেছনে এ সমস্ত কারণগুলো গভীরভাবে কাজ করছে। তাই এত হিংসা, তাই এত রক্তপাত।

স্বৈরাচারকে এখনই প্রতিহত করা প্রয়োজন

'৭০-এর দশকে এ বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস। সেই সন্ত্রাসের মুখোমুখি হতে ভয় পায়নি অকুতোভয় হাজার হাজার যুবক-যুবতী। শুধু রাজনীতির কর্মীরাই নয়, অসংখ্য গণতান্ত্রিক মানুষ সেই সন্ত্রাসকে মোকাবিলার পথে নেমেছিলেন। গলি থেকে শহরের রাজপথ সর্বত্রই আওয়াজ উঠেছে 'গণতন্ত্র ধ্বংস হতে দেব না' বলে। বাংলা আজ সেই সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে—একদিকে লুম্পেন রাজ, অন্যদিকে আপামর বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মানুষের জোট। নির্বাচনের নামে এ রক্তস্নান বন্ধ করার দাবিতে আমাদের পথে নামা জরুরী। সম্ভাব্য সমস্ত মিত্রশক্তিকে এই রাজনৈতিক প্রচারাভিযানে নামানোর জন্য সর্বত্রই আমাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আগামী ২৯ জুলাই নির্বাচনের ভোট গণনার দিন। ঐদিনও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা হিংসার আবহাওয়া গড়ে তুলবে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার মত বিনা গণনায় বিজয়ী হতে চাইবে। যে কোন মূল্যে একে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালাতে হবে। গণনা-উত্তর পরিস্থিতিও যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পার্টির সমস্ত নেতৃত্ব, কর্মী, সমর্থকদের ঐক্য আরও মজবুত করে জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের পথে আমাদের পা বাড়াতে হবে। এটাই সময়ের দাবি।

- পার্থ ঘোষ

বিহারে ভূমি মাফিয়াদের হাতে শহীদ লড়াকু নেতা

বিহারের কৈমূর জেলার তিয়ারি বাজারের কাছে গত ১৭ জুন বাড়ি ফেরার পথে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর সংগঠক কমরেড ফেকু শর্মাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে স্থানীয় ভূমি মাফিয়ার ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী। তাঁর বাড়ির পাশেই নুয়াব অঞ্চলে জমি নিয়ে আন্দোলন চলছিল। ভূমিহীন মহাদলিত বর্গের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছিল যে সমস্ত খাস জমিতে, গ্রামের গুন্ডা বিজয় বাহাদুর সিং ঐ জমি কব্জা করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। জনগণ গুন্ডাদের ধরে ফেলে এবং গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ কিন্তু গুন্ডাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে গ্রামীণ গরিবদের বিরুদ্ধে কেস রুজু করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্থানীয় গরিব মানুষের লড়াইয়ের নেতা ফেকু শর্মাকে হত্যা করে জমি হাঙর গুন্ডাবাহিনী।

গরিব কৃষক পরিবারের সন্তান কমরেড ফেকু শর্মা ২০০৫ সালে গ্রামের শিবমুরত যাদব নামের এক বদবাবু-গুন্ডার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে যান। তিনি কোনরকমে লিখতে পড়তে জানলেও পার্টি শিক্ষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং পার্টির সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কাজে অগ্রবর্তী যোদ্ধা ছিলেন। কমরেড ফেকু আয়ালা (সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য ও কৈমূর জেলা কমিটির সহ সম্পাদক ছিলেন, পার্টির জেলা কমিটির সদস্য ও দুর্গাবতী অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। পার্টির সদ্যসমাপ্ত রাঁচী কংগ্রেসেও নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ভূমি আন্দোলনের শহীদ কমরেড ফেকু শর্মা লাল সেলাম।

উত্তরবঙ্গে পঞ্চায়েতে প্রচার সভা

শিলিগুড়ি শহরের সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত ২ নং ডাবগ্রাম পঞ্চায়েতে পার্টির প্রতীকে গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২ জন মহিলা প্রার্থী। ফকদইবাড়ি ২৫ এবং ২৬ নং আসনে রয়েছেন যথাক্রমে কমরেড শিপ্রা সরকার এবং কমরেড বীভারাণী বেলা। আগামী ২৫ জুলাই পঞ্চম এবং অন্তিমপর্বে নির্বাচনের প্রাক্কালে গত ২০ জুলাই ফকদইবাড়ি বটতলায় আয়োজিত হয় এক নির্বাচনী জনসভা। তৃণমূল সরকারের প্রত্তিপতিশালী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র এই অঞ্চলে। অথচ অঞ্চলের বেশিরভাগ অঞ্চল জলমগ্ন, রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা, শ্রমজীবী জনতা খাদ্যের সুরক্ষা, সুলভে বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। বিগত ৫ বছর ধরে তৃণমূল-বিজেপি জোটের রাজত্বে এই পঞ্চায়েতটি দুর্নীতির শিরোনামে উঠে এসেছে। এর বিরুদ্ধে পার্টির স্থানীয় নেতৃত্ব লাগাতার অভিযান চালাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচার সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য গৌরী দে, পবিত্র সিংহ, বাসুদেব বসু, জেলা কমিটি সদস্য অপু চতুর্বেদী, মোজাম্মেল হক এবং ছাত্রনেত্রী শ্বাশতী সেনগুপ্ত। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মীরা চতুর্বেদী। সভা পরিচালনা করেন কল্লোল চক্রবর্তী।

জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের অন্তর্গত পাটকাটা পঞ্চায়েতের রাইপুর চা বাগানে পার্টির প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চা শ্রমিক আদিবাসী যুবক রাজেশ ওঁরাও। রাইপুর চা বাগানটি দীর্ঘদিন বন্ধ পরে থাকার পর ২০১০ সালে নতুন মালিকের অধীনে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চুক্তি মেনে নিয়ে খোলা রয়েছে। দীর্ঘদিন লেগে পড়ে থাকার পর সম্প্রতি এই বাগানে ইউনিয়ন গঠন করা গেছে। পূর্বতন ও বর্তমান মালিক কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে চা শিল্প ভিত্তিক ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির অনাদায়ে এখন দৈনিক মজুরি মাত্র ৯০ টাকা। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে দেখিয়ে রেশন বা অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা থেকে শ্রমিক পরিবারগুলো বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। গত ২১ জুলাই দুপুরে রাইপুর চা বাগানে বন্ধ পড়ে থাকা ফ্যাক্টরি সংলগ্ন মাঠে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বাসুদেব বসু, অভিজিৎ মজুমদার, জেলা কমিটি সদস্য সুভাষ দত্ত, মুকুল চক্রবর্তী, শ্রমিক কমরেড স্বপন হালদার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী। সভাটি পরিচালনা করেন রঞ্জিত লোহার।

উদীয়মান জাপান-ভারত সম্পর্ক ...

ছয়ের পাতার পর

নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ও চুক্তি শর্ত লঙ্ঘন করার দায়ে। নয়া দিল্লীর কাছে গোরক্ষপুরে চারটি চুল্লী নির্মিত হচ্ছে কিন্তু সেখানে প্রায় কোন জলের উৎস নেই। এই চুল্লীগুলো শীতল করার জন্য যে ক্ষুদ্র ক্যানালের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা এ বছরের প্রথমদিকে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় পরমাণু শিল্পের কাজকর্মে মারাত্মক ধরণের সমস্যা রয়েছে। ভারতের রয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস। তা কেবল অদক্ষই নয়, তা চিহ্নিত হয়ে আছে দুর্ঘটনা, গোপনীয়তা, সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি অনুশীলন করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করা—এসব দ্বারা। এর মধ্যে রয়েছে তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত কাজকর্মে ক্যাজুয়াল শ্রমিক ভাড়া করা হয়েছে যাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য বীমা ছাড়াই এবং কোনরূপ দুর্ঘটনার দায় নেওয়া থেকে মুক্ত থাকছে। পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা, পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক বোর্ড হল এক নখদন্তহীন সংস্থা যা অর্থ এবং প্রযুক্তির জন্য সেই পরমাণু শক্তি দপ্তরের ওপর নির্ভরশীল, যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই গঠন করা হয়েছে।

ফুকুশিমা দুর্ঘটনায় জাপানের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে এবং সেদেশের সমস্যা জর্জরিত পরমাণু শক্তি শিল্পকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে অন্য দেশে পরমাণু প্রযুক্তি বিক্রী করার যে প্রয়াস জাপান নিয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। জাপান প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে তুরস্ক, ভিয়েতনাম, জর্ডন, ভারত, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, ব্রাজিল এবং সৌদি আরবের নতুন নতুন পরমাণু শক্তির বাজারে। মিৎসুবিশি, হিতাচি ও তোশিবা-র মত জাপানী কোম্পানীগুলো এই সমস্ত চুক্তি থেকে বিপুল মুনাফা লাভ করবে। তবে এই সমস্ত দেশগুলোর পারমাণবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার এবং দক্ষ মানব সম্পদের অভাব রয়েছে। আর তাদের পারমাণবিক প্রকল্পগুলো নিরাপদভাবে এবং দায়বদ্ধতার সাথে চালনার জন্য উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতাও নেই। জাপান বিবেচনা করছে মঙ্গোলিয়ায় পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থ মজুত ভাণ্ডার স্থাপন করার কথা, যা স্থানীয় জনসাধারণ তীব্র বিরোধিতা করছে। পারমাণবিক রপ্তানীকে উৎসাহদানের মাধ্যমে তার পরমাণু শক্তি কর্পোরেশনগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জাপানের পলিসি তার নিজের দেশেই সমালোচিত হয়েছে। এক সাম্প্রতিক সম্পাদকীয়তে 'দ্য জাপান টাইমস' লিখেছে, ''এমন একটা সময়ে মিঃ আবে পারমাণবিক প্রযুক্তি রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছেন যখন টোকিও ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কোম্পানীর ফুকুশিমা ১ নং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পারমাণবিক সংকট রয়েছে এবং ফুকুশিমার বহু অধিবাসী ঐ কারখানা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শের ভয়ে ভীত হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। তাদের মধ্যে প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষ এখনও তাদের নিজেদের বাড়ী ফিরতে পারছে না তেজস্ক্রিয়তা দূষণের কারণে। এছাড়াও, জাপান সরকার এবং জাপানী সংসদ (ডায়েট) কর্তৃক স্থাপিত অনুসন্ধান কমিটির সমীক্ষা সত্ত্বেও ফুকুসিমা পারমাণবিক সংকটের যে এখনও ফয়সালা হয়নি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে।'' (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গণহত্যার বিচার এবং তামাদিকরণের রাজনীতি

উপমহাদেশের বিগত ৬৬ বছরের ইতিহাসে রাষ্ট্রের পরিচালনায়/মদতে বহু গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। কখনও তা যুদ্ধাপরাধের আকার নিয়েছে। কখনও সাম্প্রদায়িক নিধনের। কখনও জনজাতিদের দমনের। কখনও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের। এই প্রকারগুলোও কোনও স্পষ্ট বিভাজন নয়। প্রায়শই ঘাতকদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির বিচারে বিভাজনগুলো মিলে গেছে। আর এই উপমহাদেশে আমরা বার বার দেখেছি, জনসমক্ষে গণহত্যাকারীরা চিহ্নিত হয়ে গেলেও বিচার ব্যবস্থার নাগালের বাইরে তারা মূলধারার কোনও না কোনও শাসক শ্রেণীর অংশ হয়ে গেছে। সুমহান গণতান্ত্রিক কাঠামোর অসাড়তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে! এক একটি রক্তাক্ত গণহত্যার অপরাধকে ধামাচাপা দিতে কার্যত তামাদি করে দেওয়া। আজ এক গণহত্যাকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব দেখছে। শ্রীলঙ্কার গদিতে আসীন গণহত্যাকারী সরকার। ১০টা কমিশন তৈরি হয়েছে কিন্তু শিখ নিধনের কারবারীদের শাস্তি হয়নি। ইতিহাসের এই প্রেক্ষিত থেকে দেখলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ঘাতকদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে জন-আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন এক নয়া অধ্যায়ই বটে। বিশেষত, কুখ্যাত কাদের মোল্লা, দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, বাচ্চু রাজাকার, কামরুজ্জামানদের শাস্তি এবং সম্প্রতি জামাতের শীর্ষনেতা গোলাম আজমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবি রাখে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্য গোনা হয়েছিল ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে। ২ লক্ষাধিক বীরাঙ্গনা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সহ দেশীয় ঘাতক-দালালদের ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। রায়েরবাজার, মীরপুরের বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশের স্তূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-যুবদের গণহত্যা, জাঠিভাঙ্গা-শাঁখারিপাড়ায় সংখ্যালঘু হত্যাকাণ্ড, অসংখ্য গণকবরের খোলা ক্ষতের ওপর দিয়েই অতঃপর 'বঙ্গবন্ধু'র অধঃপতন, তানাশাহী এবং মৌলবাদী ঘাতকদের জাতীয় রাজনীতিতে পুনরুত্থানের কুনাট্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ঘা এবং গণহত্যার বিচারের দাবি— এ দুটোর কোনোটাই সে দেশের জনগণের মন থেকে মুছে যায়নি। যে সময়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং প্রাণঘাতী দাঙ্গার মাধ্যমে হিন্দু সংখ্যাগুরু মৌলবাদ ভারতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, সে সময়ে বাংলাদেশে গোলাম আজম হয়ে উঠছে জামাত-এ-ইসলামীর সর্বেসর্বা। আর সে বছরই হাজারে হাজারে মানুষ জমায়েত হচ্ছেন 'শহীদ জননী'র আহ্বানে। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি সংগঠিত করছে গণআদালত। সমস্ত অপরাধের বিচার করে গোলাম আজমকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিচ্ছে। সেটা ১৯৯২ সাল। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনতার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের (আই সি টি) আইনি বিচারের মান্যতা পেল। যদিও এবার গোলাম আজমের ফাঁসির হুকুম হয়নি।

আই সি টি-র অধীনে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার আইনি মানদণ্ড নিয়ে কিছু সমালোচনা রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, রাজাকারদের পাশাপাশি পাকিস্তানি সামরিক-ঘাতকদের শাস্তি নিয়ে। ফাঁসির দাবি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ এই আন্দোলনের পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে যেটা প্রশ্নাতীত সেটা হল দীর্ঘ অপেক্ষার পর একটা শুরু। শহীদদের গণহত্যার ক্ষতকে বোজানোর আন্দোলনে বিপুল জনসমর্থন। বিরাট সংখ্যায় ছাত্র-যুবদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও রাজনীতিকরণ। জামাত-শিবিরের আক্রমণের মুখেও আন্দোলনের দৃঢ়তা। যুদ্ধের অপরাধ, গণহত্যার অপরাধের যখন বিচার হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে নতুন করে ইতিহাস লেখা হয়। জনতার কাছে ঘাতকদের অপরাধকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সমাজ তার অতীতের কালো অধ্যায়কে মুছে সামনের দিকে এগোতে পারে। একথা ঠিক যে মুক্তিযুদ্ধের হিসেব চোকানোর এখনও অনেক বাকি। তবু গোলাম আজম সহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধী গণহত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।

এখন প্রশ্ন হল, শাহবাগ আন্দোলন কী শিক্ষা নিয়ে আসছে? তার শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই জনবিস্ফোরণ যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অসাড়তাকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, এখানকার গণহত্যার কারবারীরাও শাহবাগের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আসলে অন্য দেশের, অন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অনেক ক্ষেত্রেই এক 'অপর' নির্মাণে সক্ষম হয় যা নিজের দেশের সংখ্যালঘুর ওপর সন্ত্রাসের যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই শাহবাগের আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ানোর একটাই উপায়—নিজের নিজের দেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। আমরা ভারতের প্রতিটি গণহত্যার বিচার চাই।

কাশ্মীরে কয়েক হাজার অচিহ্নিত গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজার হাজার নিখোঁজ (অপহৃত, অত্যাচারিত, ভূয়ো সংঘর্ষে মৃত) যুবকের নামের তালিকা প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রকে কাশ্মীরে গণহত্যার জন্য দায়ী করলেই আপনি দেশদ্রোহী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গণহত্যা চলছে—আড়ালে আবডালে নয়, কালা কানুনের ছত্রছায়ায়। গত বছর ইন্টারন্যাশানাল পিপলস ট্রাইবুনাল অন হিউম্যান রাইটস অ্যাণ্ড জাস্টিস ইন ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্টারড কাশ্মীর এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ পেরেন্টস অফ ডিস্যাপিয়ার্ড পার্সনস এই দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে 'অ্যালিজড পারপিট্রেটরস' (অভিযুক্ত অপরাধী) নামক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ২১৪টি 'নিখোঁজের' ঘটনার বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করে তার জন্য দায়ী ৫০০ জন অভিযুক্তের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০০ জন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার। কোন আদালতে ঐ গণহত্যাগুলোর বিচার হবে? কোথায় বিচার হবে মণিপুরের মনোরমার মত অসংখ্য ধর্ষিতা নারীর? দিনের পর দিন আফস্পার আড়ালে ঢেকে রাখা অসংখ্য গণহত্যার সংগঠক সেনাবাহিনীর বিচার করবে কারা?

আজ সজ্জন কুমার, জগদীশ টাইটলার, কমল নাথের মত '৮৪-র গণহত্যাকারীরা আদালতের ক্লিন চিট পেয়ে অপরাধের দায় থেকে মুক্ত। নানাবতী কমিশন গণতন্ত্রের লজ্জা। একের পর এক ভূয়ো সংঘর্ষের সংঘটক, পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চালক, গণহত্যাকারী নরেন্দ্র মোদীর শুধু যে বিচার হয়নি তাই নয়। তিনি বারংবার মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনর্নির্বাচিত হয়ে এখন প্রধান বিরোধী দলের জাতীয় নির্বাচনী প্রচারের মুখ। গুজরাত গণহত্যাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে সর্বোচ্চ মহলে। আন্তর্জাতিক স্তরেও মোদীকে তার অপরাধের ছায়া থেকে বের করে এনে সুপ্রশাসকের ভূমিকায় পুনর্বাসিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু, ইশরাত জাহানের মৃত লাশ তাড়া করে বেড়াচ্ছে মোদীর কর্পোরেট বর্তমানকে। বাবু বজরঙ্গী, মায়া কোদনানি সহ গুজরাত গণহত্যার সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত বাহিনী জেলের ভেতর। কিন্তু যে সেনাপতির প্রশংসা এরা নিজেরাই তেহেলকার লুকানো ক্যামেরার সামনে করেছিলেন তিনি আজ মিডিয়ার তৈরি করা র‍্যাম্বো, যিনি দেশের সব সমস্যার সমাধান নিজের আস্তিনে লুকিয়ে রাখার দাবি করছেন।

কাশীপুর, বরানগরের রক্তস্নাত কসাইখানা। যখন প্রতিবেশী দেশের জনতা '৭১-এর ক্ষতগুলোকে মেরামত করছেন, তখন সেই দশকেরই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিধনযজ্ঞের জল্লাদ গণহত্যাকারী সিদ্ধার্থ রায়ের হানাদার বাহিনীর বিচার আজও হয়নি। মানব শরীর নশ্বর কিন্তু শহীদের রক্তের হিসেব কখনও তামাদি হয় না। একমাত্র গণআন্দোলনই পারে ঘাতক-দালালদের শাস্তির হিসেব বুঝে নিতে। পথ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ।

- কস্তুরী

তৃণমলের সন্ত্রাসই শেষ ...

একের পাতার পর

এ বিষয়ে স্নেহশীল ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের দাপাদাপিতে আজ কলেজ ক্যাম্পাসগুলো অশান্ত ও বিষাক্ত হচ্ছে, অতি সম্প্রতি তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রবীন্দ্র ভারতী ক্যাম্পাস আবার রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার কোন সদিচ্ছা বা বলা যেতে পারে ক্ষমতাই নেই। কেননা মমতা শাসনের প্রাণভোমরা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এরাই। তাই তৃণমূল সংগঠন অনুব্রত বা মনিরুলের বিরুদ্ধে প্রকৃতই কোন ব্যবস্থাই নিতে পারেনি, আর পরবর্তীতে যদি নেয়ও, তবে তা হবে নিছকই আনুষ্ঠানিক। আর, তাপস পাল বা মদন মিত্র বা সুব্রত মুখার্জী বা শুভেন্দু অধিকারীর কথা বাদই থাক।

এখন মমতা ব্যানার্জী বলছেন যে একদফাতেই রাজ্যের পুলিশ দিয়ে ভোট করলে এতো জীবনহানি ঘটতো না। হিংসার কোন ঘটনাই ঘটতো না। এটাই তিনি চেয়েছিলেন। অবশ্য তথ্য বলে ২০০৩ সালে একদফাতেই ভোট হয় এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫৮। আসলে তিনি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট করাতে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিজের কব্জায় রাখতে। তাহলে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, বিরোধীদের দিক থেকে কোন বাধা বা অবরোধ গড়ে উঠবে না। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট চলবে অবাধে এবং তা চলবে রক্তপাতহীন ভাবেই। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার পরেও কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা থেকে সরকার তাদের সরিয়ে রাখে।

মমতা শাসনের এই দিকগুলো যখন সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখে পড়ে, তখন কিছু বুদ্ধিজীবী আমাদের নজরকে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের দিকে নিয়ে গিয়ে তুলনা করতে বসেন। এটা কোন ভুলে যাওয়ার বিষয় নয় সি পি এম তথা বামফ্রন্টের শাসন এক জনবিরোধী দমনমূলক শাসন হয়ে ওঠে। এদের হাতেই ঘটে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে সরকারি বর্বরতা। এটা ছিল সম্পূর্ণই এক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শাসন। পার্টিতে সমাজবিরোধী ও বাহুবলীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার জনগণ লড়েছেন। আমরাও লড়েছি এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ এই শাসনকে উপড়ে ফেলে। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি ছিল—জনগণের রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা। জনগণ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন পুরানো জমানাকেই নতুন রূপে ডেকে আনার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও জীবন জীবিকার দাবিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সুতরাং আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেউ যদি নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে পুরানো জমানার সঙ্গে তুলনা করে বর্তমান জমানার পক্ষে সাফাই গাইতে বলেন তবে তা হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল। জনগণ অবশেষে তৃণমূল জমানার কাছ থেকে হিসাব চাইবে এবং সেই হিসাব তৃণমূল সরকারকে অবশ্যই চোকাতে হবে।

- কল্যাণ গোস্বামী

স্মরণসভা

বামপন্থী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী সদ্য প্রয়াত কমরেড বাদল পালের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ জুলাই বারাসতে সুভাষ ইনস্টিটিউটে। স্থানীয় বাদল পাল স্মরণ কমিটির আহ্বানে ঐ কর্মসূচী আয়োজিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি সত্তর দশকে কলেজে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন নকশালবাড়ির বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ সি পি আই (এম এল) ধারায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হন। জনগণের বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণপ্রতিরোধের রাজনীতিতে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি সি পি আই (এম এল) লাল ঝান্ডা সংগঠনের সদস্য ছিলেন। ৩০ জুন তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

কমরেড বাবুনি মজুমদারের কণ্ঠে "জন্মিলে মরিতে হবে রে...." গানের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা শুরু হয়। এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেড প্রশান্ত রায় ও মালেকা। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রয়াত কমরেডকে স্মরণ করেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথাকাহিনী নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড নির্মল ঘোষ, মৌলিনাথ গাঙ্গুলি, খোকন সেনগুপ্ত, জয়ন্ত সমাদ্দার, সুধীর মন্ডল, ধনা মালি, নোটন কর, বাচ্চু চক্রবর্তী ও দিলীপ দত্ত; এছাড়া বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি মানস দাস। সভা সঞ্চালনা করেন শ্রীকুমার দে।

৫ আগস্ট

বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সরোজ দত্তের ৪২তম শহীদ বার্ষিকীতে

স্মরণ কর্মসূচী

কলকাতা সুরেন্দ্র নাথ পার্ক

(সরোজ দত্তের আবক্ষ মূর্তির সামনে)

শঙ্কর ব্যানার্জী স্মারক বক্তৃতা

বিষয় ঃ মেয়েদের চাই নির্ভয় স্বাধীনতা

বক্তা ঃ পার্থ ঘোষ ও শাশ্বতী ঘোষ

স্থান ঃ হুগলী জেলা পরিষদ হল, চুঁচুড়া

৪ আগস্ট (রবিবার) বেলা ৪টা

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com